নারায়ণ সান্যাল

রানী হওয়া

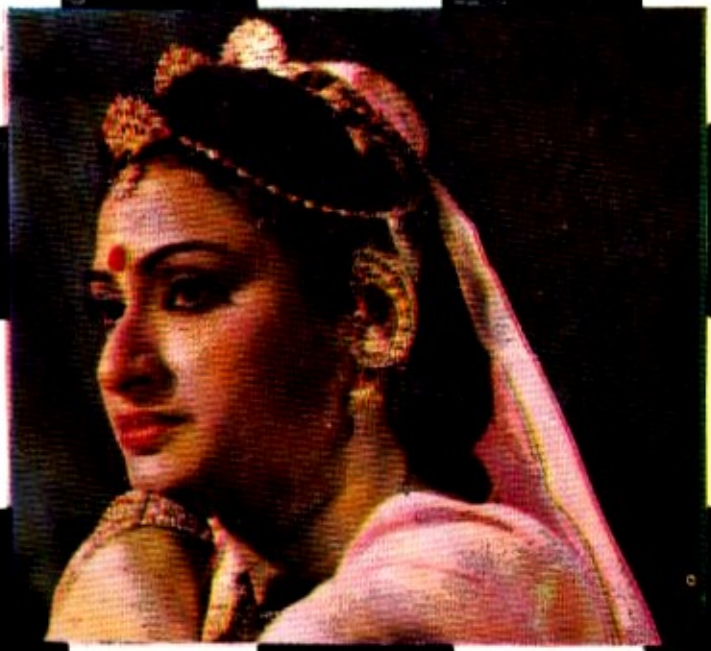

রানী হওয়া

নারায়ণ সান্যাল

পরিবেশক
নাথ ব্রাদার্স ॥ ৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট ॥ কলকাতা ৭০০০৭৩

প্রথম প্রকাশ
মাঘ ১৩৭২

প্রকাশক
সমীরকুমার নাথ
নাথ পাবলিশিং
২৬ বি পণ্ডিতিয়া প্লেস
কলকাতা ৭০০০২৯

প্রচ্ছদশিল্পী
সুধীর মৈত্র

মুদ্রাকর
সনাতন হাজরা
প্রভাবতী প্রেস
৬৭ শিশির ভাদুড়ী সরণী
কলকাতা ৭০০০০৬

রানী হওয়া

॥ এক ॥

সাততলায় এসে লিফ্‌ট-এর খাঁচাটা থামল। সাত-আটজনের দলে মিশে গিয়ে অসীমাও বার হয়ে এল বদ্ধ খাঁচা থেকে। আর সকলে দেখা গেল নিজ নিজ গন্তব্যস্থল সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল। লক-গেটের দ্বার খোলা পেলে জলস্রোত যেমন ডানে-বাঁয়ে তাকায় না—নির্দিষ্ট পথে ছুটে চলে, তেমনি সবাই চলতে থাকে। ও একটু থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। ইতি-উতি তাকিয়ে দেখে। পুব-পশ্চিম দুদিকেই করিডর ; কোন দিকে এগিয়ে যাবে ঠাওর হয় না। চলমান জনস্রোতে যতক্ষণ তুমি জঙ্গম ততক্ষণ তোমাকে কেউ নজর করবে না ; যেই দাঁড়িয়ে পড়লে অমনি হয়ে গেলে দর্শনীয় বস্তু। তাছাড়া ওর সাজ-পোশাক এবং প্রসাধন-পরিপাট্যের দৈন্য এ পরিবেশের সঙ্গে রীতিমতো বেমানান। রাজহংসদলে নেহাৎ বক। মরিয়া হয়ে শেষমেশ এক বৃদ্ধকে প্রশ্ন করল, 'মাপ করবেন ; আগারওয়াল এন্টারপ্রাইজের অফিসটা কোন দিকে বলতে পারেন ?'

থ্রি-পীস গ্রে-স্যুট-পরা বৃদ্ধ মুখ থেকে পাইপটা সরিয়ে নিয়ে বললেন, 'নিত্যি-নতুন অফিসে এই হাই-রাইজ বিল্ডিংটা ছেয়ে গেছে, মা, ব্যাঙের ছাতার মতো রোজই নতুন নতুন অফিস গজিয়ে উঠছে। কেউ কারও খবর রাখে না। তুমি আর একবার নিচে নেমে যাও। একতলায় সিঁড়ির পাশে একটা বড় বোর্ড আছে। সেখানে লিস্ট বানানো আছে—কোন্ ফ্লোরে কত নম্বর ঘরে কার অফিস। সেটাই এই মাল্‌টি-স্টোরিড্ 'বুক্'-এর সূচীপত্র : ইন্ডেক্স পেজ। তোমাকে আর একবার নিচ-উপর করতে হবে।

অসীমা বৃদ্ধকে ধন্যবাদ দিতে যাচ্ছিল, তার আগেই চলমান জনস্রোতের

ওপাশ থেকে একজন বলে ওঠে, 'আমাদের সঙ্গে এস, আমরা ঐ অফিসেই যাচ্ছি।'

অসীমা চোখ তুলে দেখল বক্তাকে। প্রায় ওরই সমবয়সী, দু-এক বছরের এদিকে-ওদিক হতে পারে। ওরা দুজন পাশাপাশি যাচ্ছে। সম্ভবত সহকর্মী, করণিক। বৃদ্ধের 'তুমি' সম্বোধনটা ছিল আন্তরিক, কারণ অসীমা তাঁর মেয়ের বয়সী—তাছাড়া বাক্যের মাঝখানে একটি মাত্র-সম্বোধনও বক্তব্যটাকে স্নিগ্ধ করে দিয়েছিল ; কিন্তু এবার এ ভদ্রলোকের ঐ 'তুমি' সম্বোধনটা ওর কানে বাজল। কারণ ওরা দুজনে প্রায় সমবয়সী, ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ।

বাজারে সব্জিওয়ালি বা স্টেশানে মালবাহী মেহনতি মানুষটিকে সম্বোধনের সময় যেমন অনায়াস-ভঙ্গিতে 'তুমি'-টাই জিবের আগায় এসে যায়। হেতুটা—বুঝতে অসুবিধা হয় না অসীমার—ওর আজকের এই সাজপোশাকের দীনতা। সিল্ক না হোক, অন্তত পাটভাঙা একখানা সুতির শাড়িও যদি পরে আসতে পারত, পায়ে এই রবারের চপ্পলের বদলে থাকত খুট-খুট-খুরওয়ালা জুতো, তা হলে ঐ সমবয়সী ভদ্রলোকের মুখ থেকে এমন অনায়াস-ভঙ্গিতে 'তুমি' সম্বোধনটা বার হয়ে আসত না। ক্ষেত্রবিশেষে 'আপনি' থেকে 'তুমি' হচ্ছে উত্তরণ, সমবয়সীদের মধ্যেও, সেখানে মূল প্রেরণা : ভালবাসা, প্রেম। আবার ঐ 'আপনি' থেকে 'তুমি' হয় অবরোহণ—যেখানে মূল প্রেরণা অর্থনৈতিক শ্রেণীসচেতনতা। অসীমা নিঃশব্দে ওদের পিছন পিছন চলতে থাকে। অসীমা খেয়াল করেনি—ওরা দুজনে হাঁটতে-হাঁটতে ক্রমে দুজনের মাঝে একটা ফাঁক সৃষ্টি করে গতিবেগ কমিয়ে দিয়েছে। সেটা অনুভব করল যখন নিজেকে আবিষ্কার করল দুই করণিকের মাঝখানে 'স্যান্ডুইচড্' অবস্থায়।

ওদের ভিতর চশমাচোখো প্রশ্ন করল, 'আগারওয়ালা এন্টারপ্রাইজে' কার সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছ বল তো ?'

অসীমা ওর প্রশ্নটা পাশ কাটিয়ে প্রতিপ্রশ্ন করে, 'আপনারা দুজন ঐ অফিসেই কাজ করেন বুঝি ?'

চশমাচোখো নাছোড়বান্দা। বললে, 'তা করি। কিন্তু কই, বললে না তো কার সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছ ?'

এবার আর এড়িয়ে যাওয়া সম্ভবপর হল না। প্রয়োজনও ছিল না। কাউকে-না-কাউকে তো প্রশ্নটা করতেই হবে, জেনে নিতে—যার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে তিনি কোথায় বসেন। তবু কী জানি কেন, একটু ইতস্তত করে বললে, 'এম. ডি. প্যাটেল।'

ওর দু-পাশে দুজনেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে। নিউটনের এক নম্বর 'গতিসূত্র'-মোতাবেক অসীমা দু পা এগিয়ে গিয়ে ব্রেক কষল। পিছন ফিরে বলল, 'কী হল ?'

'এম. ডি. প্যাটেল ? এম. ডি. ?'

'হ্যাঁ, কিন্তু আপনারা অমন অবাক হচ্ছেন কেন ? এম. ডি. এখন এ অফিসে বসে না ?'

চশমাচোখো একটু আমতা-আমতা করে বলে, 'বসেন, কিন্তু উনি তো : এম. ডি.।'

'হ্যাঁ, মুরলীধর—এম. ডি.। তাতে কী হল ?'

'না, না, তা বলছি না—আমি বলছি, এম. ডি, মানে ম্যানেজিং ডাইরেক্টার।'

'তাই হবে তাহলে। শুনেছি, খুব বড় চাকরি করে, অনেক টাকা মাইনে পায়।'

চশমাচোখো কী যেন বলতে যায়, জবাবে। তারপর থমকে থেমে যায়। পার্শ্ববর্তী চলমান ব্যক্তিটির দিকে ফিরে অনুচ্চকণ্ঠে বলে, 'গণেশদা....'

গণেশদা বয়সে কিছু বড়। মাথায় ছোট। টাক, পুরুষ্টু এক জোড়া গোঁফে সে খামতিটা মেটাবার চেষ্টা করেছেন বোধহয়। পার্শ্ববর্তীকে নিম্নস্বরে বললে, 'চেপে যাও।'

তারপর সপ্তপদ গমনও হয়নি। টাক-সর্বস্ব মাঝের দিকে ফিরে বললে, 'ইয়ে হয়েছে, আপনি একটু ইদিকে সরে আসুন দিকি।'

অসীমা চলমান জনস্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে দেওয়াল ঘেঁষে দাঁড়ায়। সময়টা লাঞ্চ-আওয়ার্সের কাছাকাছি। করণিক ও নানা শ্রেণীর কর্মীতে করিডর ক্রমশই উপচীয়মান। সবাই চলেছে নিচে। ফুটপাথের ধারে নানান জাতের খাদ্য-দ্রব্যাদি মহাকর্ষর মূল্যমানকে বৃদ্ধি করে ওদের অধঃপতিত হতে আকর্ষণ করছে। অসীমাকে একান্তে নিয়ে এসে টাকমাথা জানতে চায়, 'ইয়ে, আপনার অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে তো ?'

'অ্যাপয়েন্টমেন্ট ? না তো !'

'টেলিফোনেও ওঁকে জানাননি যে, লাঞ্চ আওয়ার্স নাগাদ আপনি ওঁর সঙ্গে দেখা করতে আসছেন ?'

'ওর টেলিফোন-নম্বর আমি জানিই না।'

চশমাচোখো এবং টাকমাথার মধ্যে অর্থপূর্ণ দৃষ্টি বিনিময় হল। চশমাচোখোই শেষমেশ বললে, 'অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছাড়া স্যার তো কারও সঙ্গে দেখা করেন না।'

'তাই বুঝি ? কিন্তু সে তো আপনাদের ম্যানেজিং ডাইরেক্টার। আমি তো তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসিনি। আমি এসেছি মুরলীর কাছে....'

'মুরলী ! অ্যাক্কেরে মুরলী !' —টাক-মাথার আর 'একবাওঁ মেলে না'। অসীম ক্ষমতাশালী রাশভারী এম. ডি.—ইউনিয়ানকে পর্যন্ত যিনি পাত্তা দেন না, মন্ত্রীদের সঙ্গে যাঁর ডান-হাত বাঁহাতের দহরম-মহরম—সেই সর্বশক্তিমানকে এই চটি-ফট্-ফট্ শাঁখা-সর্বস্ব যে এভাবে নাম ধরে ডাকতে পারে সেটা বোধ করি ওর দুঃস্বপ্নেরও অগোচর।

চশমাচোখো গলা খাঁকারি দিয়ে বলে, 'এক্সকিউজ মি ম্যাডাম, আপনি কি....মানে....ইয়ে...আমাদের এম. ডি-র কোনও আত্মীয়া ?'

'আত্মীয়া ? নাতো ! আত্মীয়া কেন হতে যাব ? মুরলী আমার সহপাঠী, ক্লাসফ্রেন্ড।'

'অ। তা ইয়ে, আপনি বরং আমাদের রিসেপশানিস্টের সঙ্গে প্রথমে দেখা করুন। তিনি একটা স্লিপ দেবেন। তাতে আপনার নাম, ঠিকানা আর সাক্ষাতের প্রয়োজনের কথাটা লিখে দেবেন। উনি তখন বড়-সাহেবকে ইন্টারকমে জানাবেন....'

'ইন্টারকম কী ?' —অসীমা জানতে চায়।

টাকমাথা এতক্ষণে ধাতস্থ হয়েছে। বলে, 'সে একরকম যন্তর। তা ওসব আপনাকে বুঝতে হবে না। আসুন আপনি, আসুন দিকি আমার পিছন-পিছন। আপনাকে মিস ডরোথির কাছে পৌঁছে দিই আগে। ভিজিটার্স-স্লিপে সব ইংরেজিতে লিখতে হয় কিনা ! চলুন, আমি আপনার হয়ে লিখে দেব অখন....'

অসীমা প্রশ্ন করে 'ডরোথি কে ?'

'ইয়ে, ডরোথি নয়, মিস ডরোথি। আমাদের বড় সাহেবের রিসেপশানিস্ট। ঐ যে, ঐটে তার ঘর—'

অসীমা তাকিয়ে দেখল। করিডরটা এখানে ত্রিধারায় বিভক্ত। যেন ত্রিবেণীসঙ্গম। বাঁ-দিকের ঘরখানার সামনে, দরজার পাশে পিতলের একটা ঝকঝকে নেমপ্লেট—আয়নার মতো মুখ দেখা যায়। তাতে কালো হরফে লেখা আছে 'এম. ডি. প্যাটেল, এম. ডি.।' যেন ওর পিতৃদেব জন্মমুহূর্তেই দিব্যদৃষ্টিতে দেখতে পেয়েছিলেন সদ্যোজাত সন্তানটি আখেরে চাকুরির ক্ষেত্রে উন্নতির কোন সপ্তম স্বর্গে অধিষ্ঠিত হবে। তাই ওর কৌলিক উপাধিটিকে নাম আর পদমর্যাদার মাঝখানে স্যান্ডুইচ করে ছেড়ে দিয়েছিলেন। দরজার এপাশে একটা টুল দখল করে বসে আছে উর্দিধারী। বড়সাহেবের খাস-আর্দালি। তার পাশের ঘরখানায়

প্রবেশ-দ্বারের উপরে কোম্পানির ঝকঝকে পিতলের নেমপ্লেট। তাতে লেখা : 'রিসেপশান'।

অসীমা হাত দুটি জোড় করে ওদের দুজনকেই যুক্ত নমস্কার করে বলল, 'অসংখ্য ধন্যবাদ। এবার আমি নিজেই যেতে পারব।'

এপাশে একটি দরজায় বিজ্ঞপ্তি : 'লেডিজ'।

দেখ-না-দেখ মেয়েটি সেই দরজা খুলে সুট করে ভিতরে ঢুকে গেল।

চশমাচোখো বললে, 'ব্যাপারটা কী বল তো গণেশদা ?'

টাকমাথা ক্ষুব্ধকণ্ঠে বলে, 'কেমন নেমকহারাম দেখলি ? ইংরেজি জানে না, বাপের জন্মে 'ইন্টারকমের' নাম শোনেনি, বললুম, 'এস মা, তোমার স্লিপটা ভরে দেব'—তা কথাটা কানেই নিল না। টক্ করে আমাদের 'আউট-অব-বাউন্ড'-এ পালিয়ে গেল ?'

চশমাচোখো বললে, 'না, গণেশদা, তুমি 'এস—মা' বলনি। তুমি এট্টু এট্টু করে তেতে উঠছিলে—ও বুঝতে পেরেছিল—তাতেই টুক করে কেটে পড়ল।'

টাকমাথা ধমকে ওঠে, 'যা—যা ! মেলা কপ্‌চাস্ নে। অমন ইয়ে আমি কত দেকিছি। ভ্রূক্ষেপও করি না।'

'তা নয়। আমি ভাবছি, অন্য একটা কথা। বড়সাহেব তো দিল্লি স্কুল অব্ ইকনমিক্সের ছাত্র। তার আগে পড়তেন প্রেসিডেন্সিতে। আর তার পরে এম. বি. এ. করেছেন। ঐ চটি-ফট্-ফট্ স্যারের ক্লাস-ফেন্ড হয় কোন সুবাদে ? বললেই হল ?'

'আরে ভাই, কলেজের আগে কিশোর-কিশোরীদের তো স্কুলের একটা পর্যায় থাকে ? খোকা-খুকুর : কাফল্যভ ? সে-কালে ছিল পাঠশালা। এ-কালে নার্সারি স্কুল। কোথাও না কোথাও ওরা নিশ্চয় এক ক্লাসে পড়েছে।'

'আমি বাজি রাখতে পারি, তা নয়। শুনেছি, বড়সাহেব মুসৌরী না সিমলার কোন কনভেন্ট স্কুলে পড়তেন—ঐ চটি-ফট্-ফট্... ?'

টাকমাথা এবার গম্ভীরভাবে বলে, 'শোন ভাই রমেশ, বেশি ফট্‌ফট্ কর না। তোমার নতুন চাকরি। আমি অনেক দেখেছি, অনেক শুনেছি। অনেক, অনেক এম. ডি. চরিয়েছি। ঐ বড়সাহেবের পুরো নামটা তো মনে আছে ? মুরুলীধর। এটা তো মান ? বাঁশী নয়, ক্ল্যারিওনেট নয়, ফুলুট নয়, মুরুলী।'

'তার মানে ? আর তাছাড়া কথাটা মুরুলী নয় গণেশদা, মুরলী।'

'ঐ হল। তুই আর আমাকে উরুশ্চারণ শেখাতে আসিস না। শোন্, বাঁশী যে-সে বাজাতে পারে। তুই-আমি পারি, সাপুড়ে থেকে পুলিশ, রেলগাড়ির গার্ড

থেকে ফুটবল মাঠের রেফারি। ফুঁক-ফুঁক যে যখন খুশি বাজায়। কিন্তু 'মুরুলী' ?

'কী বলতে চাইছ তুমি ?'

'মুরুলী বাজায় শুধু বংশীবালা। তার এক্তিয়ারে ষোড়শ গোপিনী। ফাইভ-স্টার হোটেলের কলগার্ল থেকে চটি-ফট-ফট তথাকথিত সহপাঠিনী পর্যন্ত বংশীবালার মুরুলী-ধ্বনিতে মোহিত—সব্বাই। তুই ছাপোষা মানুষ, কেন বেহুদ্দো চাকরিটা খোয়াবি ? আয়, ইদিকে আয়,—আলুকাবলি খাবি আয়।'

লেডিজ-রুমে ঢুকে অসীমা ইতিউতি তাকিয়ে দেখে। মেঝেটা মসৃণ—ঝকঝক-তক্‌তক্‌ করছে। দেওয়ালে দেড়মিটার উচ্চতা পর্যন্ত শাদা পোর্সেলিন-টালি। ফিনাইলের উৎকট গন্ধকে চাপা দেওয়া রুম-পিউরিফায়ারের একটা স্নিগ্ধ সৌরভ। অসীমা একটা ওয়াশ-বেসিনের কাছে এগিয়ে গেল। আয়নায় নিজের মুখখানা দেখল। চম্‌কে উঠল। আশ্চর্য ! যেন চিনতেই পারছে না নিজেকে। কাঁধের ঝোলা-ব্যাগ থেকে একটা চিরুনি বার করে কপালের কৌতূহলী চুলের গুচ্ছকে শাসনে আনল। ঝোলাটা হাতড়ালো—নাঃ ! পাউডার বা সাবান কিছুই সঙ্গে করে নিয়ে আসেনি। অবশ্য এ ঘরে লিকুইড-সোপ আছে। তাতেই হাতটা ধুয়ে নিল। কোমরের কাছে আবার হাতড়ালো—নাঃ ! নেই। ট্যাক্সিতে কিংবা ভিড়ে রুমালটা কখন খোয়া গেছে। অভ্যাস তো নেই। উপায় কী ? মুখটা ঘামে ভিজে গেছে। আঁচল দিয়েই ঘর্মসিক্ত তৈলাক্ত মুখখানা ঘষে ঘষে মুছে নিতে হবে। কপালের বিন্দি-টিপটা খুলে নিয়ে সাবধানে আয়নায় লাগিয়েছে কি লাগায়নি ও-পাশ থেকে রাশভারী মহিলাকণ্ঠে কে-যেন ধমকে ওঠে, 'ওটা কী হচ্ছে ?'

অসীমা আঁতকে ওঠে। ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখে ওপাশে একটি আয়নার সামনে টুলে বসে আছেন স্থূলকায়া এক কালা-মেমসাহেব। তাঁর কমপ্যাক্ট বার করে তিনি ভুরু আঁকছিলেন। অসীমা জানতে চায়, 'কোন্‌টা ?'

'আযনার গায়ে আঠা-দেওয়া বিন্দি-টিপ্‌ সাঁটলে মিরারটা দাগী হয়ে যাবে না ?'

'ও আয়াম সরি।' —অসীমা আয়না থেকে খুলে বিন্দি টিপটা বেসিনের গায়ে আটকে দেয়। আঁচল দিয়ে সযত্নে আয়নার কাচটা মুছে দেয়। দাগটা উঠে যায়। ওর মনে পড়ে যায় নিজের গৃহস্থালীর কথা। এই আয়নার গায়ে বিন্দি-টিপ সাঁটার বদ অভ্যাসটা ওর প্রাকবিবাহ জীবন থেকে নিরবচ্ছিন্ন ধারায় চলে আসছে। এখনও ধমক খেতে হয় কর্তার কাছে। ও অবশ্য হার মানে না।

জবাবে মুখে মুখে তর্ক করে, 'বেশ করব, আয়না নোংরা করব। না হলে তুমি আমার জন্যে এত এত দাসী-বাঁদী রেখেছ কেন ? ওদের যে বাতে ধরবে। আমি একদিক থেকে ঘরদোর নোংরা করে যাব আর ওরা আর একদিক থেকে সাফা করে যাবে।'

কালা-মেমসাহেব কুৎকুতে চোখে অ্যাই-ল্যাশের শেড দিতে দিতে বলেন, 'আপনাকে এই অফিস-কম্‌প্লেক্সে আগে কখনো দেখিনি তো ?'

যাক। কালা-মেমসাহেব তবু ওকে 'আপনি' সম্বোধন করেছে।

অসীমা জবাবে জানায়, 'না, আমি এখানে চাকরি করি না।'

'তাই বলুন।'

অসীমার মুখ-মোছা শেষ হয়েছিল। ভ্রূমধ্যে বিন্দি-টিপটা আবার সেঁটে দেয়। হঠাৎ কী মনে হয়। কানের দুল দুটো খুলে নেয়। ভ্যানিটি ব্যাগের একটা খোপে রেখে দেয়। দুলহীন নিরাভরণা মুখখানা আর একবার দেখে। হ্যাঁ, এবার ঠিক হয়েছে।

অভ্যাসবশে বাঁ-হাতের মণিবন্ধের দিকে তাকিয়েই ওর মনে পড়ে যায়—ওর কোন হাতেই আজ ঘড়ি নেই। দু-হাতে দুটি শাঁখা মাত্র। আর বাম অনামিকায় সর্বাঙ্গের একটি মাত্র অলঙ্কার—চুনি-বসানো একটি সোনার আংটি।

॥ দুই ॥

উর্দিধারী আর্দালির কাছে পায়ে-পায়ে এগিয়ে আসে। লোকটা টুলে বসে সাবধানে নিজের কর্ণকুহরে একটা পাখির পালক প্রবিষ্ট করায় ব্যস্ত ছিল। অসীমা ঘনিয়ে এসে জানতে চায়, 'সাহেব আছেন ?'

লোকটা এতই ব্যস্ত যে, তার জবাব দিতে দেরী হল। অসীমা অপেক্ষা করল। ওর কানে খোঁচা লেগে যেতে পারে, আচমকা। পাখ্-পালকটা নিয়নালোক দেখার পরে লোকটার চোখ দুটো খুলে গেল। অসীমাকে আপাদমস্তক দেখে নিয়ে বসে বসেই বললে, 'কেন ? দেখা করতে চাও ?'

অসীমা অসীম বিস্ময়ে নির্বাক দাঁড়িয়ে থাকে।

লোকটা পুনরুক্তি করে, 'কী ব্যাপার গো ? তোমার যে বাক্যি হরে গেল ? বলি কি, সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে চাও ?'

অসীমা এতক্ষণে কণ্ঠস্বর ফিরে পায়। আর্দালিটাও যে ওকে নিকটবন্ধু ভেবে 'তুমি' সম্বোধন করবে এতটা আশঙ্কা ছিল না। তত্ত্বটা জানা ছিল। তত্ত্ব হিসাবেই। অর্থাৎ আজকের সমাজে মানুষের প্রাথমিক মর্যাদা তার পোশাকে-আশাকে। মাধ্যমিক মর্যাদা তার চলনে-বলনে এবং অন্তিম স্বীকৃতি আর্থিক কৌলিন্যে। কোন তত্ত্বটাই নতুন নয়। তবে ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতায় মনুষ্যত্বের এমন মূল্যায়নটা এতদিন যাচাই হয়নি। এই যা। বললে, 'হ্যাঁ, তাই তো চাই। উনি কি আছেন ?'

'উনি আছেন-কি-নেই সে হিসেব পরে। আগে বল, তোমার কাছে 'তিনি' কী আছেন ?'

'মানে ?'

'অ্যাপয়েন্টমেন্ট সিলিপ্ গো ? আছেন ?'

'না নেই, শোন....'

লোকটা মাছি তাড়ানোর ভঙ্গিতে হাত নাড়ে। বলে, 'আমি শুনলে কোন ফায়দা হবে না, দিদি। ভবি ভুলবে না। ঐ ঘরে আগে যাও। ঐ মেনিমুখো বসে আছে—ওর কাছে গিয়ে ভিজিটিং সিলিপ বানিয়ে আনো.....'

'মেনিমুখো ?'

'ঐ দ্যাকো না, কটা চোখ, নেউলের গায়ের লোমের মতো চুল, ফরক পরে বসি আছেন! কলকাঠি সব ওঁর হাতে। তবে এখন নয়। এখন সাহেব লাঞ্চে যাবেন। লাঞ্চের পরে এস অখন।'

অসীমা জানতে চায়, 'সাহেব লাঞ্চে গেলে তুমি কী করবে ?'

আর্দালি একগাল হাসল। বললে, 'আমি ? আমি কী করবাম ? এইহানে বইয়া বইয়া ভাটিয়ালি গাইবাম ; 'পরান বন্‌ধু রে—এএএ....'

অসীমাও হাসল। ওর গান শুনে। বললে, 'মৈমনসিং ? অ্যাঁ ? নেত্রকুনা মনে লাগে ?'

আর্দালি সোজা হয়ে বসল। সে বিস্মিত।

অসীমা তার ঝোলা-ব্যাগ থেকে চতুষ্কোণ কী-যেন-একটা বার করে ঐ লোকটার নাকের ডগায় মেলে ধরল। বললে, 'অফিসের ভিতর ভাটিয়ালি গাইলে ধমক খেতে হয়। ধমকে পেট ভরে না। এইটা রাখ ; সাহেব লাঞ্চে গেলে তুমিও যা হোক কিছু কিনে খেও বরং। কেমন ?'

'খুড়োর কল' কবিতায় সুকুমার রায়ের আঁকা ছবিটা মনে আছে ? আর্দালির চোখ দুটো হয়ে গেল তেমনি নাটা-নাটা। ধীরে ধীরে টুল ছেড়ে উঠে দাঁড়াল সে। যেন ভানুমতীর ভেল্‌কি দেখছে! ঐ শাঁখাসর্বস্ব মহিলাটির বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ আর তর্জনীর মাঝখানে যা ধরা আছে তা অবিশ্বাস্য—ট্যাঁকশাল থেকে সদ্য নির্গত পঞ্চাশ টাকার একখানা করকরে নোট।

প্রতিবর্তী প্রেরণায় সবার আগে ওর মনে যে কথাটা জাগল তাই জিগ্যেস করে বসল ফস্ করে, 'জাল ?'

নিরাভরণা অসীমা বিনাবাক্যব্যয়ে ওর হাতে গুঁজে দিল নোটখানা।

লোকটা ইতিউতি দেখে নিয়ে পিছন ফিরল। পরীক্ষা করল, আলোর বিপরীতে। দেখল, বিশ্বাস হল। আবার এপাশ ফিরে মুখোমুখি হল মহিলাটির। এবার দেখল, তাঁর বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ আর তর্জনীর মধ্যে ধরা আছে একটা হাতচিঠি।

অসীমা বলে, 'এই চিঠিখানা তোমার সাহেবের হাতে দিয়ে এস। তারপর

তিনি যদি আমার সঙ্গে দেখা না করেন, তাহলে তোমার কোন দোষ ধরব না। তবু ঐ নোটখানা আমি ফেরত চাইব না। বুঝলে ?'

আর্দালির গলকণ্ঠটা বার-দুই ওঠা-নামা করল। তারপর বলল, 'বিনা-সিলিপে আপনাকে ঘুষতে দিলে সাহেব আমার গালে ঠাস করে এক চড় কষিয়ে দেবেন।'

অসীমা বললে, 'ও মা, তাই বুঝি ? ঠিক আছে, তাহলে নোটখানা ফেরত দাও।'

নোটখানা এতক্ষণে সযত্নে ওর বুক পকেটে ঠাঁই পেয়েছে। লোকটা মর্মান্তিকভাবে প্রশ্ন করে, 'নোটখানা ফেরত দিতে হবে ?'

'হবে না ?' পঞ্চাশ টাকা 'পান' খেতে পারবে আর তার উপর ঠাস্ করে একটা চড় খেতে পারবে না ? আর তাছাড়া ভেবে দেখ, তুমি তো আমাকে সশরীরে ঘুষতে দিচ্ছ না, শুধু ঘুষ খেয়ে হাতচিঠিখানাকে ঘুষতে দিচ্ছ। সাহেব আপত্তি করলে আমি ঘরে ঘুষব না। ঘুষটাও ফেরত চাইব না।'

আর্দালি নতনেত্রে যুক্তিটার সারবত্তা প্রণিধান করল। মাথা নাড়াল। তারপর মাথা খাড়া রেখে 'গুজ্ স্টেপে' সাহেবের ঘরের দিকে এগিয়ে গেল।

যেন মেরী অ্যান্টনিয়েট এগিয়ে যাচ্ছেন গিলোটিনের দিকে।

পর্দা সরিয়ে, ঘরের ভিতরে ঢুকে গেল।

সাহেব তাঁর টেবিলে বসে নেই। হ্যাঙার থেকে কোটটা পেড়ে সবে গায়ে চড়িয়েছেন। লাঞ্চে যাবার প্রস্তুতি। আয়নার ভিতর নজর করে টাইটাকে সযত্নবিন্যস্ত করতে ব্যস্ত। আয়নার ভিতর দিয়েই দেখতে পেলেন আর্দালিকে।

'আবার কী ? ভিজিটার্স স্লিপ ? লাঞ্চের আগে আর হবে না। কাল আসতে বলে দে।'

'ও-বেলা আসতে বলব, স্যার ?'

'না। ও-বেলা আর আমি আসছি না।'

'না....মানে....ইয়ে, ভিজিটার্স সিলিপ্ নয়, স্যার। হাতচিঠি।'

'হাতচিঠি ! মানে ? কার ?'

'আজ্ঞে, নাম তো জানি না। শুধিয়ে আসব ? একজন ভদ্রমহিলার।'

'ভদ্রমহিলা !'

আর্দালি ডানহাতের কনুই বাঁ-হাতে ছুঁয়ে বাড়িয়ে ধরে চিরকুটখানা। চোখ বন্ধ। খোলা থাকলে বলা যেত : মেদিনীনিবদ্ধদৃষ্টি। যেন শিবের মাথায় বেলপাতা চড়াচ্ছে।

অন্যমনস্কের মতো সাহেব ওর হাত থেকে চিরকুটখানা ছিনিয়ে নিলেন। দু-চার লাইন ছাইপাঁশ কী লেখা ছিল তা তিনিই জানেন। হঠাৎ কেমন যেন উদাস হয়ে গেলেন। একদৃষ্টে দেয়ালে-গাঁথা এয়ার-কন্ডিশনারটার দিকে তাকিয়ে রইলেন।

প্রায় দশ সেকেন্ড সেদিকে নির্বাক তাকিয়ে থেকে এম. ডি. বললেন, 'কী চায় অসীমা?'

আর্দালির ধ্যানভঙ্গ হল। চোখ দুটো খুলে গেল। মুখ তুলে চোখে-চোখে তাকিয়ে বলল, 'শুধিয়ে আসব, স্যার?'

এম. ডি. কিছুটা বিব্রত, কিছুটা বিরক্ত। বুঝতে পারেন, আত্মসম্বোধিত প্রশ্নটা নিজের অজান্তে ওঁর ওষ্ঠাধর উচ্চারণ করে বসেছে। তৎক্ষণাৎ সামলে নিয়ে বলেন, 'পাঠিয়ে দে।'

আর্দালি পালিয়ে বাঁচে।

পরক্ষণেই দুলে উঠল পর্দাটা।

এম. ডি. দেখতে পেলেন শাঁখা-সর্বস্ব একজোড়া যুক্তকর। কুণ্ঠাজড়িত চরণে এগিয়ে আসছে অসীমা। এম. ডি. প্রতিনমস্কার করে না। বলে, 'বস'।

নিজেও বসে তার গদি-আঁটা আসনে। অসীমা বসল ওর দর্শনার্থীর চেয়ারে। কাঁধ থেকে শান্তিনিকেতনী ঝোলাটা নামিয়ে রাখল পাশের চেয়ারটাতে।

অন্যায়—তবু মনে মনে তুলনা করে ফেলল এম. ডি.। ঐ নিরাভরণার সঙ্গে তার ধর্মপত্নীর। অসীমার মুখে প্রসাধনের চিহ্নমাত্র নেই। নিতান্ত আটপৌরে একটা মিলের শাড়ি। সুতির শাড়ি, সুতির ব্লাউজ। কিন্তু কী দারুণ ফিগার! 'টরসোটা' ডম্বরু-আকৃতি মধ্যক্ষামা। উপরে পুরন্ত-উরস। নিচে নিবিড়-নিতম্ব। একবিন্দু মেদের আভাস কোথাও পড়েনি। কেমন করে এমন ফিগার রাখতে পেরেছে ঐ 'অদ্যভক্ষ্যধনুর্গুণ'? অথচ রানী? আটটা বিবাহ-বার্ষিকী উদযাপিত হয়নি এখনো—এরই মধ্যে প্রায়-পৃথুলা। বাৎস্যায়ন যাকে বলেছেন 'হস্তিনী' ততখানি নয়, তবে মধ্যক্ষামা আর তাকে বলা চলে না। রানীর একটা দোষ: শরীরের যত্ন নেয় না। প্রসাধন সেও করে না। ভিন্নতর কারণে—রানীর প্রসাধনে বিতৃষ্ণা। আর অসীমার পক্ষে প্রসাধনের অভাবটা আর্থিক হেতুতে।

এই অসীমা সেন ওর প্রথম প্রেম—অসীমা আজও পদ্মিনী নারী। বিনা প্রসাধনেই সে সদ্য-প্রস্ফুটিত পদ্মের মতো তরতরে তাজা।

অসীমা চোখে-চোখে তাকাতে পারছে না। বোধ করি সঙ্কোচে। [illegible]

মুরলীধর জানে পুরুষকেই প্রথম পদক্ষেপ করতে হয়।

বলল, 'প্রায় দশ বছর পরে। কী বল ?'

অসীমা এখনো চোখে-চোখে তাকাতে পারছে না। নতনেত্রে বললে, 'না। এগার বছর, চার মাস।'

'আমার ঠিকানা পেলে কেমন করে ?'

এতক্ষণে চোখ তুলে তাকায়। বলে, 'কেন ? আজকের খবরের কাগজে। তোমরা একটা বিজ্ঞাপন দিয়েছ না ? তাতেই।'

'ও হ্যাঁ। কিন্তু এম. ডি. প্যাটেল তো একটা সাধারণ নাম। ঐ নামে টেলিফোন ডাইরেক্টরিতে আমি তো পাঁচজনের সন্ধান পেয়েছি।'

'বাকি চারজনের কেউ কি কোনও কোম্পানির ম্যানেজিং ডাইরেক্টর ? তুমি ইকনমিক্সে ফার্স্টক্লাস, তারপর বিজনেস ম্যানেজমেন্ট পড়তে দিল্লি গেছিলে, তাই আন্দাজ করলাম।'

'বুঝলাম। থাক—ওকথা। অ্যাডটা আজই কাগজে ছাপা হয়েছে। সেটা দেখেই যেভাবে ছুটে এসেছ তাতে আন্দাজ করছি তোমার তরফে ব্যাপারটা জরুরি। তাই নয় ?'

'হ্যাঁ, জরুরি তো বটেই। কিন্তু তোমার লাঞ্চের দেরি হয়ে যাচ্ছে না তো ?'

বিচিত্র হাসল প্যাটেল। বলল, 'যাচ্ছে। কিন্তু পুরানো বান্ধবীর খাতিরে না হয় একদিন দেরিই হল। বল, কী কথা বলতে এসেছ। সেটা জেনেই লাঞ্চে যাব বরং।'

'তার আগে বল, আজ লাঞ্চে তোমার কি কোথাও স্পেসিফিক নিমন্ত্রণ আছে ?'

'না নেই। কিন্তু এ-কথা কেন ?'

'না, মানে আমিও তো সেই সাত-সকালে শ্রীরামপুর লোকালে রওনা হয়েছি। চল না, আমরা দুজনে কোন রেস্তোরাঁয় খেতে খেতে কথা বলি ? এককালে প্রেসিডেন্সির সামনে কফি-হাউসে যেমন.....'

হঠাৎ মাঝপথে নিজে থেকেই থেমে যায়।

বলে, 'আয়াম সরি।'

'কী হল ?'

'বোকার মতো কথা বলছিলাম। এই খানদানি 'পশ্' পাড়ার কোনও রেস্তোরাঁয়....মানে, আমি যে পোশাকে এসেছি....'

সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে মুরলীধর। প্রশ্ন করে, 'কেন এ পোশাকে এসেছ সীমা ? বেনারসী-বালুচরী না থাক, তোমার আলমারিতে কি একখানা পাটভাঙা

সুতির শাড়িও ছিল না ? রবারের ঐ মুগুর-মার্কা বাথরুম-স্যান্ডেল ছাড়া কি তোমার একজোড়া চামড়ার চটিও নেই ?'

'অমন করে কেন বলছ মুরলী ?'

'বলছি এজন্য যে, তুমি ইচ্ছে করে, জেনে-বুঝে এই বেশে এসেছ, যাতে লাঞ্চ আওয়ার্সে তোমাকে বাইরে কোনও রেস্তোরাঁয় নিয়ে যেতে না পারি।'

'তাতে আমার স্বার্থ ?'

'য়ু নো বেটার। 'আমার অনেক আছে' এটা শো-অফ করাকে আমরা বলি 'হামবড়াই' ভাব, ঠিক তেমনি তার কনভার্স....না থাক। এতদিন পরে দেখা, গায়ে-পড়ে ঝগড়া করব না। এখানেই কিছু খাবার আনিয়ে লাঞ্চ সারা যাক বরং। কী খাবে বল ? তুমি সেই সাত সকালে....কী নাম বললে যেন ? শ্রীরামপুর লোকাল না ? তুমি বুঝি এখন শ্রীরামপুরে থাক ?'

'হ্যাঁ।'

'শ্রীরামপুরের কোথায় ?'

'তুমি শ্রীরামপুরে গিয়েছ কখনো ? পাড়ার নাম বললে চিনবে ?'

'না, শ্রীরামপুরকে তেমনভাবে চিনি না। মানে, জিগ্যেস করছিলাম, ওখানে কি কর্মসূত্রে আছ, নাকি শ্বশুরবাড়ি ?'

অসীমা জবাব দিল না। নীরবে নখ খুঁটতে থাকে। মুরলী তাগাদা দেয়, 'কী হল ? বিয়ে করেছ নিশ্চয়।'

'হ্যাঁ। ওকে নিয়েই পড়েছি মহাবিপদে।'

'বিপদে ! কী বিপদ ?'

'মেন্টাল কেস। লোকাল ডাক্তার কী একটা গালভারি নামও বলেছিলেন। আসলে মেলাঙ্কলিয়া। দুর্মনস্যতা। কলকাতায় নিয়ে এসে সাইকিআট্রিস্টকে দিয়ে ভাল করে দেখানো দরকার। কিন্তু সে তো অনেক খরচের ব্যাপার....'

'আই সী। কী করেন তিনি ? আই মীন.....অসুখের আগে কী করতেন ?'

'কী আবার করতেন। ইন্‌কেলাব্।'

'ইন্‌ক্লাব মানে ?'

'ইউনিয়ানে পাণ্ডাগিরি। লক্ষবার বারণ করেছি। কর্ণপাত করেনি। যেমন জেদী, তেমনি একরোখা। অন্যায়ের সঙ্গে কোন রকম আপোষ করতে রাজি নয়—এই ওর ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা। স্ট্রাইক-লক্‌আউট মিটে গেল। শুধু ওরা দুজন বাদে। সুবল ঠাকুরপো সুইসাইড করে বাঁচল, আর ও সুইসাইড না করে জীয়ন্তে মরে রইল।'

'ইউনিয়ন কিছু করল না ?'

'ইউনিয়ন কী করবে ? দু-দশ টাকা ভিক্ষে দেওয়া ছাড়া ? একে তো আর রি-ইনস্টেট করা সম্ভবপর নয়। ইতিমধ্যে ও যে পাগল-হয়ে গেছে।'

মুরলী রুমাল বার করে কপালটা ব্লট করল। এয়ার-কন্ডিশনারটা চলছে। ঘাম হবার কথা নয়। তবু কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করছিল সে। বললে, 'ভেরি স্যাড কেস। আয়াম সরি।'

অসীমার রুমাল নেই। আঁচল দিয়েই মুখটা মুছল শুধু।

মুরলী বলে, 'যা হোক, দুনিয়া তো বসে থাকবে না। তবু সংসার করে যেতে হবে আমাদের। কী ? খাবার কিছু আনতে দিই তাহলে ? এখানে বসেই খাওয়া যাবে। কী খাবে বল ? তন্দুরী না চাইনীজ ?'

অসীমা নড়েচড়ে বসল। বলল, 'তোমার যা ইচ্ছে আনিয়ে খাও মুরলী, আমি কিছু খাব না।'

'খাবে না ? কেন ? এই যে বললে সাত-সকালে বাড়ি থেকে বার হয়েছ ?'

'সেটা মিছে কথা নয়। কিন্তু...'

'কিন্তু কী ?'

ম্লান হাসল অসীমা। বলল, 'ঐ যে তুমি 'চাইনীজ' খাবারের কথা বললে না, তাতেই খিদের ইচ্ছেটা হঠাৎ মরে গেল।'

মুরলীধর হাসতে হাসতে বলে, 'কেন ? চাইনীজ খাবার মানে কিছু আরসোলা ভাজা নয়। এককালে ঐ চাইনীজই তো খেতাম আমরা, সুযোগ পেলেই—চাঙওয়ায়, পিপিঙে।'

অসীমা ঝুঁকে পড়ে সামনের দিকে। বলে, 'এক্সাক্টলি ! আরসোলা-ভাজা। জান মুরলী, ঠিক ঐ কথাই একদিন জানতে চেয়েছিল বাবলু ; চাইনীজ খাবার কাকে বলে মা ? তাতে কি আরসোলা-ভাজা থাকে ?'

মুরলীর হাসিমুখটা গম্ভীর হয়ে যায়।

অসীমা একই নিশ্বাসে বলে চলে, 'বেচারি তো তার সাত-বছরের জীবনে কোনো দিন চাইনীজ খাবার খায়নি। তাই জানে না। ওকে সেদিন বলেছিলাম....'

মুরলী ওকে বাধা দিয়ে বলে ওঠে, 'তোমার বুঝি ঐ একটিই সন্তান ?'

'হ্যাঁ, সর্বজয়ার মতো।'

'সর্বজয়া ! কোন্ সর্বজয়া ?'

অসীমা বোধ করি ওর প্রশ্নটা শুনল না। আপন মনেই বলে চলে, 'বাবলুর ও

এক দিদি ছিল। যদিও তার নাম 'দুর্গা' নয়, আর ঝড়ের রাত্রেও সে মুক্তি পায়নি....তবু পরিণামটা একই....'

মুরলীর নিজের উপরই রাগ হল। সে ঘটনাচক্রে যা কিছু প্রশ্ন কববে তাই কি এক বিয়োগান্তক করুণ পরিণতির দিকে এগিয়ে যাবে ?

অসীমা তার দুঃখী জীবনের ছেঁড়া পাতাখানা আবার ঘ্যানর ঘ্যানর করে পড়তে শুরু করে, 'বাবলুকে কথা দিয়েছিলাম, তোর বাবার অসুখ ভাল হয়ে যাক, তারপর আমরা তিনজনে একদিন চাইনীজ খাবার বাড়িতে এনে খাব...'

মুরলীধর টেবিলের উপর পড়ে থাকা অসীমার মুঠিটা আলতো করে ধরল। বলল, 'বেশ তো, বাবলুর ইচ্ছেটা আজকেই না হয় মিটিয়ে দাও সীমা, দু-প্যাকেট চাইনীজ খাবার বাপ-বেটার জন্যে সঙ্গে নিয়ে যেও। শ্রীরামপুর পর্যন্ত যেতে যেতে ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। তা একটু গরম করে নিলেই....'

অসীমা সেই মুঠির উপর অপর হাতখানা আলতো করে পাতল। আকুলকণ্ঠে বলে ওঠে, 'না, মুরলী! একবেলার জন্যে ওদের রাজভোগ খাওয়াবার লোভ দেখিও না আমাকে। ওদের মুখে প্রতিদিন যাতে শাকান্নটুকু তুলে দিতে পারি সেই সুযোগটুকুই তুমি আমাকে করে দাও।'

ওর দুটি পেলব হাতের মাঝখানে যে লোমশ হাতখানা ক্লাব-স্যান্ডউইচের মতো উপর-নিচের ঘামে সিক্ত হচ্ছিল, সেখানা টেনে নিয়ে এম. ডি. বললে, 'আহারের প্রসঙ্গটা আপাতত মুলতুবি থাক। বরং খোলাখুলি বল, অসীমা, কী জন্যে তুমি শ্রীরামপুর থেকে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছ ?'

অসীমার নজর এড়ায়নি চিরাচরিত সংক্ষিপ্ত সম্বোধন ত্যাগ করে ম্যানেজিং ডাইরেক্টার এবার ওকে ওর পুরো নাম ধরে ডেকেছে। একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল তার। বলল. 'সে-কথা তো প্রথমেই বলেছি। তোমরা কাগজে স্টেনো-টাইপিস্ট চেয়ে বিজ্ঞাপন দিয়েছ। সেই বিজ্ঞাপন দেখেই ছুটে এসেছি।'

মাথা নেড়ে মুরলীধর বলে, 'না অসীমা, সে-কথা বলনি। বলেছিলে, সেই সূত্রে আমার সন্ধান পেয়েছিলে। অল রাইট, এখন বোঝা গেল ব্যাপারটা। কেন এসেছ বুঝলাম। হ্যাঁ, কোম্পানি ম্যানেজিং ডাইরেক্টারের জন্যে একজন কন্‌ফিডেন্সিয়াল স্টেনো-টাইপিস্টের স্যাংশন করেছে বটে। তা তুমি কি পরে স্টোনোগ্রাফি শিখেছিলে ? কত স্পীড তোমার ? ডিকটেশান এবং টাইপিঙে ?'

অসীমা মাথা নত রেখেই বললে, 'তোমরা বিজ্ঞাপনে যা উল্লেখ করেছ তার চেয়ে বেশিই ছিল এককালে। সার্টিফিকেট দেখাব ; কিন্তু বাবলুর বাবার

অসুখের পর আমাকে চাকরিটা ছেড়ে দিতে হল তো ? তাই এখন প্র্যাকটিস্ না থাকায়—'

মুরলীধর বলে, 'তা কী করে হয় ? অনেক অ্যাপ্লিকেশন পড়বে নিশ্চয়। আমরা অ্যাপ্লিকেন্টদের কম্পিটিটিভ টেস্ট করে নেব। অন্যান্য কম্পিটিটাবদের স্পীড যদি বেশি হয়....'

'কিন্তু কন্‌ফিডেন্সিয়াল স্টোনো-টাইপিস্ট-এর ক্ষেত্রে স্পীডটাই তো একমাত্র ফ্যাক্টর নয়। তার চেয়ে অনেক বড় ফ্যাক্টর তার ইন্টিগ্রিটি, তার বিশ্বস্ততা, অন্যান্য সবাই তোমার অচেনা, অজানা, একমাত্র আমাকেই তুমি চেন। গভীরভাবে চেন। তুমি জান, কলেজে মুষ্টিমেয় যে কজন ছাত্র-ছাত্রী টোকাটাকে ঘৃণা করত আমি ছিলাম সে-দলে। 'প্রক্সি'তে রাজি হইনি বলে 'ননকলেজিয়েট' হিসাবে....'

মুরলীধর ডানহাতটা তুলে ধরায় ও মাঝপথেই থেমে গেল। জিজ্ঞাসুনেত্রেই তাকিয়ে রইল তার অতি-উচ্চমঞ্চে অবস্থিত সহপাঠীর দিকে। জানতে চাইল, 'কী ?'

'বলব ? কিন্তু কিছু মনে করবে না তো ?'

'মনে করব কেন ? বল না খোলাখুলি—কী বলতে চাও।'

'একবার পিছন ফিরে তাকিয়ে কি দেখেছ সীমা ? ঐ 'ইন্টিগ্রিটি' আর 'অনেস্টি'র গঙ্গাজল-বিধৌত তুলসীপত্রটি সম্বল করে সারা জীবনে তুমি কী পেয়েছ ? রেজাল্ট বের হবার সঙ্গে সঙ্গে আমি দিল্লিতে ইন্টারভিয়ু দিতে চলে যাই—দিল্লি স্কুল অব ইকনমিক্সে চান্স পেয়ে ওখানেই থেকে যাই। তাই জেনে যেতে পারিনি তুমি আদৌ অনার্স নিয়ে পাস করেছিলে কি না। কবে তোমার বিয়ে হল, কোথায় তোমার বিয়ে হল, কিছুই জানি না। কিন্তু ঐ অনেস্টি নিয়ে পুতুপুতু করে তুমি সারাটা জীবনে কী পেয়েছ, অসীমা ?'

অসীমার চোখ দুটো ধক্ করে জ্বলে উঠল। চকমকির মতো নয়, হীরকখণ্ডের মতো, যখন তার উপর বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে আলোকপাত ঘটে। কিন্তু তারপরেই একটা প্রশান্ত হাসিতে ওর মুখখানি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। বলে, 'অন্য কাউকে লজ্জায় বলতে পারতাম না—তারা ভাবত চাল মারছি। কিন্তু তুমি আমার সহপাঠী, তুমি তো জান, আমি সরলতার মাধ্যমে সততাকে পেয়েছি। এই সর্বব্যাপী পঙ্কিল সমাজব্যবস্থায় আমি সৎ থাকার বেদনাকে সর্বাঙ্গ দিয়ে অনুভব করার আনন্দকে পেয়েছি। এটা কি পাওয়া নয়, প্রাপ্তি নয় ? গরলের মাঝখানে সরল থাকায় তৃপ্তি নেই ? মন্দের মাঝখানে কুন্দের মতো সুন্দর হয়ে ফুটে থাকার আনন্দ নেই ?'

মুরলীধর শ্রাগ করে। বলে, 'তুমি আমাকে বিলকুল ভুলে গেছ, অসীমা। তোমার মনে নেই এ জাতীয় 'গ্রীক' আমি সেকালেও বুঝতাম না। তোমার কথা শুনতে ভাল লাগছে—কিন্তু একটা ইটালিয়ান কি স্প্যানিশ সঙ্গীত তা বুঝছি না।'

'বুঝছ। কিন্তু এই কন্ট্রাডিকশানটা তুমি বরদাস্ত করতে পারছ না। আমার এই জীর্ণ পোশাক, এই ভিখারীর বেশ দেখে তুমি মানতে পারছ না ; জীবনে আমি তোমার চেয়ে সুখী ! আমি আত্মগ্লানিতে পীড়িত হই না। আমি.....'

বাধা দিয়ে মুরলী বলে, 'আয়াম সরি, আয়াম এক্সট্রিম্‌লি সরি অসীমা, আমার মনে ছিল না যে, তোমার অনার্স ছিল ফিলসফিতে, আমার ইকনমিক্সে। ও কথা যাক। এস, বরং কাজের কথাটা শেষ করি। তুমি চাকুরীপ্রার্থিনী হিসাবে আমার দ্বারে আজ অর্থী। তা ফুল-টাইম চাকরি তুমি করবে কেমন করে ? ঘরে তোমার পাগল স্বামী। তার দেখাশোনা করবে কে ?'

'কেন ? বাবলু ?'

'বাবলু ? তার স্কুল নেই।'

'না, নেই। উপায় কী বল ? স্কুল থেকে তাকে ছাড়িয়ে নিয়েছি। তিনটে মানুষের জন্য দু'-বেলা দু-মুঠো অন্নের ব্যবস্থা তো আমাকেই করতে হবে।'

এম. ডি. ধমকে ওঠে, 'বলছ কী অসীমা ? তোমার একমাত্র সন্তানকে নিরক্ষর করে রেখে দিয়ে তুমি কুন্দ ফুলের মতো সুন্দর হয়ে ফুটে থাকতে চাও ? এই পঙ্কিল দুনিয়ায় ? না হয় দু-ফোঁটা কাদার ছিটে লাগলোই গায়ে, তবু মা হয়ে সন্তানকে মানুষ করার চেষ্টা করবে না ? সে চায়ের দোকানের বয় হয়ে জীবন কাটাবে ? অথবা ট্রাকের ক্লীনার ?'

অসীমা আকুল হয়ে বলে ওঠে, 'কেন কাটাবে মুরলী ? তার যে তোমার মতো মামা আছে ! তুমি তো আমাকে ঐ সুযোগটা দেবে—যাতে তাকে আবার স্কুলে ভর্তি করে দিতে পারি। আর্থিক সঙ্গতি একটু ভাল হলেই। তখন একটি ডে-টাইম দাই-টাই রাখতে পারব। ওকে দেখাশোনার জন্য।'

এম. ডি. অনেকক্ষণ কী ভাবল। তারপর বলল, 'অবান্তর কথা থাক। তুমি যে প্রস্তাব নিয়ে এসেছ—সে কথাই বলি। আয়াম এক্সট্রিমলি সরি, অসীমা, তা হয় না। ও চাকরিটা আমি তোমাকে দিতে পারব না।'

'পারবে না ? তুমি....তুমি আমার সহপাঠী....আমার.....কী ভাষায় বলব ? ঘটনাচক্রে তুমি-আমি আজ ভিন্ন নৌকায়। কিন্তু ঘটনা তো অন্য খাতেও বইতে পারত। তখন তো আমার সব দায়িত্ব তোমাকে নিতে হত। সেদিন আমি রাজি হলে ?'

'কারেক্ট ! সেদিন তুমি কিন্তু রাজি হওনি, অসীমা—'

'হইনি, কারণ তুমি তো বিবাহ-প্রস্তাব দাওনি মুরলী....দিয়েছিলে, দিয়েছিলে, একটা ক্ষণিক দৈহিক সম্পর্কের প্রস্তাব....'

'তুমি কী আশা করেছিলে ? প্রেম হচ্ছে নিকষিত হেম ?'

'না মুরলী ! আমি আশা করেছিলাম তুমি বিবাহের প্রস্তাবটা আগে দেবে। তা তুমি দাওনি। কোন প্রতিশ্রুতিও নয়। থাক, ওসব অপ্রিয় আলোচনা। সেসব অনেক-অনেকদিন আগেকার কথা। হয়তো ভুলটা তোমার, হয় তো আমার....যা ঘটে গেছে তার তো আর বদল হবে না। এখন বল, তুমি আমাকে ঐ একটা চান্স দেবে না ? বাঁচবার একটা শেষ সুযোগ ? আমার পাগল স্বামীকে, আমার হতভাগ্য সন্তানকে....'

মাঝপথেই ওকে থামিয়ে দিল মুরলী, 'আয়াম সরি !'

অসীমাও ওকে ধমকে ওঠে : 'য়ু কান্টবি সরি অ্যাট দিস্ স্টেজ ! আগে ডিকটেশানে, টাইপিঙের স্পীডে আমাকে কেউ হারাক.....'

মুরলী দুদিকে নীরবে মাথা নাড়ছে।

'কী না ?'

'আমি নিরুপায়। শোন সীমা, বুঝিয়ে বলছি। প্রথম কথা, আমি হয়তো পরের সপ্তাহেই এই চাকরিটা ছেড়ে দেব।'

'ছেড়ে দেবে ? এমন দুর্দান্ত একটা চাকরি ? কেন ?'

মুরলী হাসল। বলল, 'এটাই এম. বি. এ.-দের নিয়তি। চাকরি-জীবনের আদিকাণ্ডে তারা ক্রমাগত চাকরি ধরে—চাকরি ছাড়ে। আজ অযোধ্যার যুবরাজ তো কাল অরণ্যচারী। ছাড়ে আর ধরে। ধরে আর ছাড়ে। অযোধ্যার সিংহাসন ছেড়ে গিয়ে বসে লঙ্কার দশাননচ্যুত সিংহাসনে। ধীরে ধীরে, ধাপে ধাপে সাফল্যের শিখরচূড়ায় উঠে যায়। মাইনে বাড়ে, পার্কস বাড়ে, গাড়ির মডেল বদলায়—ফিয়াট-অ্যাম্বাসাডার-মারুতি-কন্টেসা ! সম্মান-প্রতিপতি প্রতিষ্ঠার পরিবর্তন হয়। আজই ওবেলায় আমার একটা চাকরির ইন্টারভিয়ু। সন্ধ্যা ছয়টায়। হোটেল তাজবেঙ্গলে। ফ্যান্ট্যাসটিক জব ! ব্যাপারটা টপ্ সিক্রেট। এ অফিসে এখনো কেউ কিছু জানে না। একটা জাপানী কোলাবরেশনের মাল্‌টি-ন্যাশনাল নতুন কোম্পানীর ভারতীয় শাখার কর্মকর্তা। এখানে যা পাচ্ছি তার দ্বিগুণ মাহিনা পাব। তাছাড়া নানান পার্কস। বছরে চার-পাঁচবার ফরেন-ট্যুর। মানে সেমিনার-টেমিনার অ্যাটেন্ড করা। অবশ্য চাকরিটা যদি পাই। মুশকিল কী জান সীমা ? তুমি যেমন এ অফিসে চাকরিতে ঢোকার ব্যাকডোরটা খুঁজে বার করতে পেরেছ,

আমি তা পাইনি। কোম্পানিটা সদ্য ফ্লোট করা হয়েছে। কেউ কাউকে চেনে না। কাকে কতটা খাওয়ালে কাজ হাসিল হবে বুঝে উঠতে পারছি না। যদ্দূর শুনেছি 'ত্রিমূর্তি' আছেন জগন্নাথ টেম্পল্-এ। একজন জাপানী ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট, আর এক ভারতীয় দম্পতি। তাই নিশ্চয়তা নেই কোনও। আমার কয়জন কম্পিটিটার আছে, তাও জানা নেই। তা সে যাই হোক—দু-দুটো সম্ভাবনা। হয়, সে চাকরিটা পাব, নয় পাব না। যদি পাই, তাহলে তোমাকে এ চাকরি দেওয়াটা হয়ে যাবে এ কোম্পানির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা। কারণ সে-ক্ষেত্রে আমার সাকসেসারকে তার পছন্দ মতো লেডি-স্টেনো নির্বাচনের সুযোগ আমার দেওয়া উচিত। কিছু মনে কর না অসীমা, তোমার মতো একজন 'ফ্রিজিড অ্যান্ড পিউরিটান লেডি স্টেনো' তার ঘাড়ে চাপিয়ে যাওয়া সার্ভিস-হোল্ডার্স এথিক্সে আমার বাধবে।'

অসীমা চোখ তুলে বললে, 'ফ্রিজিড অ্যান্ড পিউরিটান'! তুমি কি মনে কর লেডি স্টেনোগ্রাফারের চাকরি মানে....'

কথাটা তার শেষ হয় না। মুরলী একই নিশ্বাসে বলে চলে, 'আর ধর যদি ঐ চাকরিটা না পাই তাহলেও অসম্ভব।'

'কী অসম্ভব?'

'তোমাকে চাকরিটা দেওয়া। কারণ রানী তোমাকে চেনে।'

'রানী! তোমার স্ত্রী। কর্নেল সিন্‌হার মেয়ে?'

'হ্যাঁ, তুমি জানতে না?'

'তাকে নিয়ে ইলোপ করেছিলে শুনেছিলাম, কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিয়ে করেছিলে কি না জানি না।'

'হ্যাঁ, তাকেই বিয়ে করেছিলাম। আমি তাকে তোমার কথা সব জানিয়েছি। সে তোমার নাম জানে, তোমার ফটো দেখেছে। তোমাকে দেখলে চিনবে।'

অসীমা অবাক হয়ে বললে, 'তুমি তাকে কী বলেছ?'

'বলেছি, যে কলেজে পড়বার সময় আমি একটা মেয়ের প্রেমে পড়েছিলাম। তাকে আমি ভালবাসতাম.....'

'এসব বাজে কথা তাকে বলতে গেলে কেন?'

'বলব না-ই বা কেন? তুমি অনেস্ট হতে পার, আমি পারি না?'

'কেন পারবে না, পারবে। কথা তা নয়। বলবে না এ জন্য যে, ওটা ভুল কথা, ভ্রান্ত কথা, মিথ্যা কথা! তাই।'

'কোনটা মিথ্যা কথা ?'

'কলেজে থাকতে তুমি আসলে কোন মেয়েরই প্রেমে পড়নি। তোমার খুব অ্যাট্রাকটিভ চেহারা ছিল, তোমার পড়াশুনার রেকর্ডও ভাল, টি-টি-তে তুমি কলেজ চ্যাম্পিয়ান ছিলে। বিয়ের বাজারে তুমি ছিলে ছাত্রীমহলে আদর্শ। তাই অনেক মেয়ে তোমার দিকে ঝুঁকেছিল। তুমি নিজে তাদের কারও প্রেমে পড়নি। তুমি শুধু একাধিক মেয়ের সঙ্গে প্রেম-প্রেম খেলা করেছিলে।'

মুরলীর চোখ দুটো জ্বলে উঠল। বলল, 'চাকরিটা তোমাকে দিতে পারছি না বলেই কি আজ স্বীকার করতে পারছ না যে, তুমি সেকালে আমার প্রেমে হেড-ওভার-হীল্‌স্‌ হাবুডুবু খেয়েছিলে ?'

'ওমা—সে-কথা আবার কখন বললাম ? আমি তো সেদিনও স্বীকার করেছিলাম—আজও করছি, মুরলী—আর সেজন্য লজ্জায় মাটিতে মিশিয়ে যাবার কোনও হেতুও আমি দেখি না—হ্যাঁ, অনভিজ্ঞ তারুণ্যের সেই মাতাল-করা দিনগুলোয় আমি একদিন তোমাকে পাগলের মতো ভালবেসেছিলাম। হ্যাঁ, যে ব্যঙ্গ-মিশ্রিত ভাষায় বললে তুমি, 'হেড-ওভার-হীল্‌স্‌'। আমি শুধু বলতে চাইছি, তুমি বাসতে পারনি। আমাকে নয়, মীরাকে নয়, জয়তীকে নয়, রানীকে নয়, কাউকেই নয়। এদের সবাইকে নিয়ে তুমি শুধু প্রেম-প্রেম খেলা করেছ, সুতরাং তুমি তোমার স্ত্রীকে কেন ওসব অবান্তর কথা বলেছ তা তুমিই জান।'

মুরলী সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে বলে, 'আমি না হয় ভুল করেছি স্ত্রীর কাছে ও কথা বলে ; কিন্তু তুমি কী করেছিলে অসীমা ? তুমি বাবলুর বাবাকে আমার সম্বন্ধে কী বলেছিলে ? আদৌ কিছু বলেছিলে কী ? মানে, সে পাগল হয়ে যাবার আগে ?'

'বলেছিলাম, মুরলী। বিশ্বাস কর। আদ্যন্ত সত্য কথাই বলেছিলাম।'

'কী ? কী তা ?'

'যে, আমি আমার এক সুদর্শন ক্লাসফ্রেন্ডকে ভালবাসতাম। ঠিক ক্লাসফ্রেন্ড নয়, তার ছিল ইকনমিক্স, আমরা শুধু পাস ক্লাসগুলো একসঙ্গে করতাম। বলেছিলাম, তাকে আমি ভালবাসতাম স্রেফ একতরফা। এ কথা বুঝেও যে, সে শুধু অভিনয় করত। সে আমাকে নিয়ে শুধু খেলাই করত।'

মুরলী সোজা হয়ে বসল। বলল, 'অল রাইট, অসীমা। 'খেলা' কিন্তু কখনো একতরফা হয় না—মানে ঐ মর্বিড বুড়োদের তাস নিয়ে একা-একা পেশেন্স খেলাটা বাদে। খেলাই যদি হবে, তবে তুমিও সে-খেলা খেলেছ, তুমিও সে-খেলাটা এন্‌জয় করতে নিশ্চয়। বয়-ফ্রেন্ডের পয়সায় সিনেমা দেখা, গ্রুপ

থিয়েটারে নাটক দেখা.....চাওমিন-চিলিচিকেন....মায় চুনি-বসানো সোনার আঙটি... ।'

অসীমা ওর গ্লাস-টপ টেবিলে হাতখানা আলতো করে রাখল। অনামিকায় একটা নকল চুনি বসানো সোনার আংটি। সেদিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল কয়েকটি খণ্ডমুহূর্ত। তারপর বলল, 'জানি না, একথার জবাব দেবার সুযোগ ভগবান আমাকে কোন দিন দেবেন কি না। কিন্তু আজ, এখন আমি প্রার্থিনী, ভিক্ষার পাত্র হাতে এসেছি তোমার দ্বারে। তাই তোমার সব কথার জবাব আমি দিতে পারছি না।'

মুরলী বললে, 'তা বটে। আয়াম সরি! মন খুলে কথা বলতে তোমার বাধছে। আমি দুঃখিত। কিন্তু তোমার হাত-চিঠিখানা পেয়ে প্রথমেই আমার কী মনে হয়েছিল জানো?'

'কী?'

'যদিচ এটা রেলগাড়ির কামরা নয়, এবং আমাদের 'হঠাৎ দেখাও' হয়নি—তুমি ঠিকানা খুঁজে-খুঁজে এসে চাকরির লোভে পাকড়াও করেছ আমাকে, তবু, আমার আশা হয়েছিল : তুমি বুঝি এসে মেলে ধরবে সেই চিরাচরিত বঞ্চিতার প্রশ্নটা—'আমাদের গেছে যে দিন....'

'থাম!'—মাঝপথেই ওকে থামিয়ে দিল অসীমা। বলে, 'প্রতারণা তুমি শুধু আমার সঙ্গেই করনি, শুধু মীরা-জয়তীদের সঙ্গেই করনি, করেছ নিজের সঙ্গেও।'

'তার মানে?'

'তুমি তো স্বীকারই করলে, আমার সঙ্গে যে ব্যবহার করেছ তা ছিল তোমার তরফে একটা মজাদার 'খেলা'। মীরা-জয়তীদের নিয়েও তুমি ঐ মজাদার খেলাটা খেলেছ। সবাই আশা করেছিল তোমার ঘরণী হবে। সবাই স্বপ্ন দেখেছিল। এদের সবাইকে বঞ্চিত করে তুমি রানীকে বিয়ে করেছিলে। কিন্তু কেন? যেহেতু সে ছিল বড়লোক বাবার একমাত্র মেয়ে। যৌতুক কী নিয়েছিলে তা তুমিই জানো, কিন্তু এও জানতে রানী হচ্ছে কর্নেল-সাহেবের একমাত্র ওয়ারিশ।'

'প্লিজ, অসীমা! বন্ধ কর এ ভাল্‌গার আলোচনা।'

'তুমি কোন্ স্পর্ধায় 'শ্যামলী'র ঐ মর্মান্তিক কবিতাটিকে ধর্ষণ করতে যাচ্ছিলে?'

মুরলী মুডটা বদলাতে চাইল। বলল, 'তুমি কি শুধু ঝগড়াই করবে? নিজেও খেলে না, আমাকেও লাঞ্চ খেতে দিলে না। অন্তত কাজের কথাটা আমাকে বলতে দাও।'

'কাজের কথা ! আবার কী কাজের কথা ? তুমি তো বলেই দিয়েছ স্টোনো-টাইপিস্টদের কম্পিটিটিভ পরীক্ষায় ফার্স্ট হলেও তুমি আমাকে চাকরিটা দিতে পারবে না। যেহেতু রাজা-মশাইয়ের রানী আমাকে চেনেন।'

'ও হো হো ! তুমি কি একটু থামবে ? প্লিজ হোল্ড য়োর টাং অ্যান্ড লেট মি....'

'লেট মি— ?'

'টক ! চাকরিটা তোমাকে দিতে পারছি না। পারলে নিশ্চয় খুশি হতাম। কিন্তু তোমাকে খালি হাতে ফিরে যেতে হবে তা তো আমি বলিনি।'

'না, বলনি। বাবলু আর তার বাপের জন্যে দু-প্যাকেট চিলিচিকেন আর চাও-মিন দিতে রাজি হয়েছিলে।'

মুরলী উঠে দাঁড়ায়। চাপা গর্জন করে ওঠে, 'অসীমা !'

'কী হল ?'

'ডোন্ট বি ফ্রিভলাস ! আমি সে অর্থে খালি-হাতে ফিরে যাবার কথা বলিনি।'

ধীরে ধীরে আবার বসে পড়ে এম. ডি.।

ঠোঁট দুটো নড়ে উঠল অসীমার। কোনক্রমে বলল, 'তুমি কি আমাকে টাকা ভিক্ষা দেবার কথা বলছ ?'

'প্লিজ অসীমা ! ডোন্ট বি ভাল্‌গার। আমার অক্ষমতাকে অন্যভাবে পুষিয়ে দিতে চাইছি। ভিক্ষাও নয়, ব্ল্যাকমেলিংও নয়,—এ আমার শাস্তি। কলেজ-জীবনে তোমার প্রতি যে অন্যায় করেছিলাম তার জন্যে এ আমার প্রায়শ্চিত্ত। হ্যাঁ, অসীমা, ক্যাশ টাকাই। অর্থদণ্ড যাকে বলে। তবে আমার তরফে একটা ছোট্ট শর্ত আছে। আমার অথবা রানীর জীবনে তুমি দ্বিতীয়বার আবির্ভূতা হবে না।'

অসীমা যেন বাক্যহারা হয়ে গেল। তার চোখ দুটি জলে ভরে এল। কোনক্রমে আত্মসম্বরণ করে বললে, 'কত টাকা ?'

'নাউ য়ু আর টকিং ! টেন গ্র্যান্ড ! দশ হাজার--ভয় নেই ! নম্বরী নোট নয়, দশ-বিশ-পঞ্চাশ টাকায়।'

অসীমার কণ্ঠ থেকে কোন শব্দ নির্গত হল না। দশ সেকেন্ড।

মুরলীধর তখন মিটিমিটি হাসছে।

শেষ পর্যন্ত অসীমাই কথা বলল, 'এ খেসারত তুমি নিজের পকেট থেকে দিচ্ছ ?'

'যদিও প্রশ্নটা অবৈধ, তোমার অধিকার-সীমার বাইরে, তবু প্রশ্ন যখন

করেছ, তখন জেনে যাও ; না, সীমা, তোমার কলেজ-জীবনের বয়ফ্রেন্ডের এতে কোনও আর্থিক ক্ষতি হবে না। তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারো।'

'তাহলে অ্যাত টাকা তুমি পাবে কোথায় ?'

'অ্যাত টাকা ? মাত্র টেন গ্র্যান্ড ? তোমার কাছে 'অ্যাত টাকা' ? শোন ! কোম্পানি আমাকে বছরে কয়েক লক্ষ টাকা খরচ করতে দেয়—নিতান্ত বিশ্বাস করে—যার স্বাক্ষরহীন হিসাব আমাকে দু-নম্বর খাতায় লিখে রাখতে হয়। এ না হলে আজকাল এ দেশে বিজনেস্ করা চলে না। বস তুমি। আমি ক্যাশ্ সেকশান থেকে ঘুরে আসছি !'

অসীমা স্থাণুর মতো বসেই রইল।

॥ তিন ॥

এম. ডি.-কে সশরীরে এগিয়ে আসতে দেখে দুজনেই বিহ্বল হয়ে পড়েন। ক্যাশিয়ার এবং চিফ অ্যাকাউন্টেন্ট। এখন লাঞ্চ ব্রেক চলছে। ক্যাশ-সেকশান জনশূন্য। শুধু আছেন ওঁরা দুজন। আর দ্বারপ্রান্তে বসে আছে বন্দুকধারী প্রহরী—শ্রুতিসীমার বাহিরে। চিফ-অ্যাকাউন্টেন্ট তাঁর টেবিলে খবরের কাগজ বিছিয়ে টিফিন বাক্সটা সবে খুলে বসেছেন। আর ক্যাশিয়ারবাবু এক শালপাতা ঘুগনি আনিয়ে নিয়েছেন। সবে আহারে বসতে যাবেন এমন সময়ে দ্বারপ্রান্তে দেখা গেল এম. ডি.-কে।

দুজনেই উঠে দাঁড়ালেন। অ্যাকাউন্টেন্টবাবু বললেন, 'ডেকে পাঠালেই তো পারতেন, স্যার ? কী ব্যাপার ?'

'আমার একটু দেরি হয়ে গেছে। আমাকে হাজার দশেক টাকা দিন তো। এক শ টাকার নোটে নয়। ইন স্মল্‌স্‌।'

'পঞ্চাশের দুটো বান্ডিলে হবে, স্যার ?'

'না। দশ-বিশে হবে না ?'

'তাও হবে, তবে সয়েল্‌ড্‌। ঝক্‌ঝকে নোট হবে না।'

'তা হোক।'

ঘর খালি। তবু এদিক-ওদিক দেখে নিয়ে ক্যাশিয়ার বলে, 'ইয়ে, আপনি পার্সোনালি নিচ্ছেন, স্যার ? নাকি দু-নম্বরী খাতায়....'

চিফ অ্যাকাউন্টেন্ট ধমকে ওঠেন, 'কাকে কী বলছ, সুরেন ! দেখছ না বড়সাহেব নিজে উঠে এসেছেন, চাইছেন স্মল্‌স্‌এ....'

এম. ডি. সহাস্যে বলেন, 'এক রাঘব বোয়াল পার্চেস্‌ অফিসারকে খাওয়াতে হবে। না হলে....'

'বুঝেছি, বুঝেছি....' ক্যাশিয়ার লোহার গা-আলমারি খুলে থাক দেওয়া নোটের বান্ডিল নামাতে থাকে।

এম. ডি. যখন নিজের খাস-কামরায় ফিরে এলেন তখন তাঁর দুই কোট আর প্যান্টের পকেট 'উপচীয়মান'।

কিন্তু এ কী? ঘরে কেউ নেই! গ্লাসটপ-টেবিলে সেই হাতচিঠিখানা। হাওয়ায় উড়ে যায়নি। কারণ সেটা চাপা দেওয়া ছিল। নকল চুনি বসানো একটা সোনার আংটি দিয়ে।

পাঁচ মিনিট স্থির হয়ে বসে থাকল। গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে। কী হতে পারে? অসীমা ওর ভিক্ষা প্রত্যাখ্যান করেছে। এতে কোনও সন্দেহ নেই। না হলে আঙুল থেকে খুলে আংটিটা ওর টেবিলে রেখে যেত না। তবু বেল বাজিয়ে আর্দালিকে ডাকল।

গরুড় পক্ষীর মতো এসে দাঁড়াল লোকটা।

'ঐ যে ভদ্রমহিলা এ ঘরে এতক্ষণ ছিলেন তিনি কি চলে গেছেন?'

'হ্যাঁ, স্যার। মিনিটপাঁচেক আগে। লিফট দিয়ে নেবে গেলেন।'

'তোমাকে কিছু বলে গেছেন কি?'

'না তো, স্যার!'

'ও আচ্ছা, যাও তুমি।'

লোকটা নিষ্ক্রান্ত হল। এবার ইন্টারকম তুলে পি. এ.-কে জানিয়ে দিল যে, ও লাঞ্চে যাচ্ছে, বিকালে আর আসবে না। রাত নয়টার পর ওকে বাড়িতে পাওয়া যাবে।

কিন্তু অসীমা এই লোভনীয় অফারটা নিল না কেন? 'অফার' বলাই ভাল। ব্ল্যাকমেল-ঘুষ তো দূরের কথা, খেসারত-ক্ষতিপূরণ জাতীয় শব্দও তো সে ব্যবহার করেনি। অসীমার মতো যাদের বিবেক-কাঁটা সর্বদা খোঁচা-খোঁচা হয়ে জেগে থাকে, তাদের জন্যেই ও ব্যবহার করেছিল একটা পাপ-পুণ্য-ঘেঁষা মোলায়েম শব্দ: 'প্রায়শ্চিত্ত'। ফলে অসীমা তার বিবেকের উপর একটা মনকে-চোখঠারা-প্রলেপ চাপা দিয়ে টাকাটা পুঁটুলি বেঁধে নিয়ে গেলেই পারত। ওর বর্তমান আর্থিক অবস্থা শুধু শোচনীয় নয় 'চোষনীয়।' যাকে বলে অদ্যভক্ষ্যধনুর্গুণ! শহরের আসার মতো একজোড়া চামড়ার চটি কেনার পয়সা পর্যন্ত নেই—এমন কি কালেভদ্রে এক প্যাকেট চাওমিন কিনে ছেলের মুখের সামনে তুলে ধরারও আর্থিক সঙ্গতি। তাহলে? পাক্কা দশ হাজার টাকা!

এত তেজ ও কোথা থেকে পায়?

অসীমা আরও বড় জাতের দাবী দিয়ে ব্ল্যাকমেল করবে, এটা ভাবাই যায় না। প্রথমত ওর স্বভাব সে রকম নয়। কলেজ জীবন থেকেই দেখেছে ; একতাল কাদা, অথবা, বলা যায়, এক ডেলা পাকা সোনা। যা দিয়ে গহনা বানানো যায় না—পান-মরার অভাবে। দ্বিতীয়ত, ব্ল্যাকমেলের বিষয়বস্তুটা কী ? কলেজ জীবনের হয় তো কিছু প্রেমপত্র অথবা ফটো, অথবা উপহার দেওয়া একটা চুনি বসানো আংটি। এই তো ব্যাপার ! বলা যায় ; কাফলাভ ! আংটি তো ফেরতই দিয়ে গেল। তা হলে ?

ওর মনে পড়ে গেল—কলেজ জীবনেও অসীমা ছিল চিরকাল রহস্যাবৃতা। সর্বদাই ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। মানসিক এবং দৈহিক।

মরুগ্‌গে ! ওর সামনে এখন দু-দুটো সমস্যা। এক নম্বর : সারাটা দিন মাথাটা ঠাণ্ডা রাখা, মন-মেজাজ প্রফুল্ল রাখা। সন্ধ্যা ছয়টায় তাজবেঙ্গলে একটা প্রকাণ্ড পরীক্ষা। উত্তীর্ণ হতে পারলে ওর জীবনযাত্রাটাই যাবে বদলে। অ্যাম্বাসাডারটা বেচে দিয়ে লেটেস্ট মডেল কন্টেসা কিনতে হবে একটা। পাঁচ-কামরার এই অ্যাপার্টমেন্টটা ছেড়ে দিয়ে কলকাতার পলিউশানের বাইরে বাগানওয়ালা একটা ম্যানশান-এ শুরু করবে নতুন জীবনযাত্রা। রানীর শুধু ইয়োরোপটা হয়েছে, জাপান আর স্টেটস্ বাকি। সে সাধ অপূর্ণ থাকবে না। তবে যুগলে ফরেন-ট্যুর 'পান্‌সে'। অর্ধেক ফূর্তিই বাদ দিতে হয় ! স্ত্রীর উপস্থিতিতে।

মরুগ্‌গে। প্রথম সমস্যা : ওর উপচীয়মান পকেট। টাকাটা ক্যাশিয়ারবাবুকে ফেরত দিয়ে আসবে ? কী দরকার ? দু-নম্বর খাতায় এন্ট্রিটা তো হয়েই গেছে। কোথাকার কোন্ পার্চেজ অফিসার টাকাটা খেয়েছিল সে কথা বোর্ড-অব-ডাইরেক্টার্স কোনদিন জানতে চাইবেন না—কোম্পানির নীট লভ্যাংশটা যদি ওঁদের মনোমত হয়।

দরজায় টোকা দিয়ে কে যেন ভিতরে আসতে চাইল।

'কাম ইন।'

পর্দা সরিয়ে ভিতরে এসে দাঁড়াল ড্রাইভার রামদীন।

ইউনিয়ানবাজির ঝামেলা এড়াতে কোম্পানির নিজস্ব কোন গাড়ি নেই। 'রেন্ট-আ-কার' সার্ভিসের এক গাদা গাড়ি থাকে। ড্রাইভাররা ইউনিয়ানবাজি করতে পারে না। পূজা-বাজারের আগেই 'অবাস্তব' বোনাস দাবী করে ধর্মঘটের নোটিস জারি করতে পারে না।

মুরলীধর প্রশ্ন করে, 'কী চাও, রামদীন ?'

'পি. এ.-সা'ব বললেন আপনি বেরুবেন। গাড়ি গেটের সামনে নিয়ে আসব ?'

'না, রামদীন। আমি অফিসের কাজে বের হচ্ছি না। আমার এক অসুস্থ আত্মীয়কে দেখতে নার্সিংহোমে যাচ্ছি। অফিসের গাড়ি নেব না।'

'তাতে কী হল, স্যার ? গাড়ি তো গ্যারেজে ফিরবেই। আর তাছাড়া আপনার গাড়ি তো অফিসে আনেননি। সেটা তো মেমসাহেব ব্যবহার করছেন।'

'জানি, রামদীন। ঠিক আছে। কিন্তু আমি ট্যাক্সি নিয়েই যাব।'

'ট্যাক্সি নিয়ে যাবেন, স্যার ? আপনি ? 'পূল'-এ তিন-তিনটে গাড়ি মজুত থাকতে ?'

'তাই যাব ! তুমি গাড়ি গ্যারেজ করে দাও। তার আগে একবার পি. এ. -সাহেবের কাছে জেনে নিও, আর কারও গাড়ি চাই কি না।'

রামদীন সেলাম করে নিষ্ক্রান্ত হল। বহুৎ-বহুৎ বড়া-সা'ব চরিয়েছে সে, কিন্তু এমন ইমানদার ইনসান সে জিন্দেগীভর দেখেনি। কোম্পানির কাজ না হলে, কোনদিন এই ভাড়া করা গাড়ি ব্যবহার করেন না সাহেব !

রামদীন নিষ্ক্রান্ত হতেই মুরলী উঠে গিয়ে নিজেই দরজায় ভিতর থেকে ছিটকিনি লাগিয়ে দিল। ব্রিফকেসটা বার করল গোদরেজের আলমারি থেকে। দু-পকেটের নোটের বান্ডিল থাক দিয়ে সাজিয়ে রাখল তার ভিতর।

তারপর ব্রিফকেসটা হাতে ঝুলিয়ে বেরিয়ে এল রাস্তায়।

'ট্যাক্সি.... !'

ও যেখানে যাচ্ছে সেখানে কোম্পানির গাড়ি নিয়ে যাওয়াটা উচিত নয় বলেই এই ট্যাক্সির বখেড়া

॥ চার ॥

ড্যালহৌসি পাড়া থেকে ভবানীপুর। আধঘণ্টাও লাগল না। দুটো বাজতে তখনো মিনিট কুড়ি বাকি। ব্যাঙ্ক আওয়ার্স চলছে। ট্যাক্সির ভাড়া মিটিয়ে বড় রাস্তার ধারে একটা নাম-করা শিডিউল্ড ব্যাঙ্কে ঢুকল মুরলী। ডানে-বাঁয়ে দেখে নিল একবার। পরিচিত কাউকে নজরে পড়ল না। এ ব্যাঙ্কে সে আসে ক্বচিৎ কখনো। এটা ওর বাড়ি এবং অফিস দুটো থেকে যথেষ্ট দূরে। তবু এখানে ওর আছে একটা সেভিংস অ্যাকাউন্ট আর আন্ডারগ্রাউন্ড ভল্টে সেই নামে একটা খোপ। দুটোই বেনামে।

সুইংডোর সরিয়ে দুই সারি করণিকের মাঝখানের গলিপথ দিয়ে এগিয়ে সে গিয়ে পৌঁছালো শেষ প্রান্তের এক দাড়িওয়ালা করণিকের কাছে।

লোকটার নাম জানা নেই। মুখ চেনা। বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। টুইলের ছোপ-ছোপ একটা হাফশার্ট গায়ে। চোখে মোটা ফ্রেমের চশমা। ওকে এগিয়ে আসতে দেখে নিজে থেকে ডেকে উঠল, 'আসুন, সাক্সেনা-সা'ব। এবার অনেক দিন পরে এলেন যে? বসুন।'

ওর সামনে একটা ভিজিটার্স-চেয়ার ঠেলে দেয়। মুরলীধর তাতে বসল। বলল, 'একবার নিচে যাব। ভল্টে।'

'সে তো ঐ ব্যাগ দেখেই বুঝেছি। তাছাড়া আমার কাছে মেহ্‌মানরা আসবেনই বা কেন? তবে একটু অপেক্ষা করতে হবে, স্যার। ভল্টে পার্টি আছেন।'

আন্ডারগ্রাউন্ড ভল্টে কয়েক শত ছোট-ছোট খুপরি। প্রকাণ্ড বড় 'হল-কামরা'। অন্তত বিশ-পঞ্চাশ জন মানুষ ছড়িয়ে ছিটিয়ে যে-যার ভল্ট-পাল্লা খুলে একই সঙ্গে কাজ সারতে পারে। কিন্তু ব্যাঙ্কের কানুনে তা হবার জো নেই।

বসে আছে তো বসেই আছে। নিচেকার লোক আর ওপরে ওঠে না। মুরলীধর প্রশ্ন করে, 'আপনাদের ম্যানেজার সেই উপাধ্যায়ই আছেন তো ?'

দাড়িওয়ালা লোকটা বললে, 'আপনি অনেক দিন যে এ-পাড়ায় আসেননি এতেই তার প্রমাণ হয়। উপাধ্যায়-সাহেব বদলি হয়ে গেলেন, তারপর এলেন মিশ্রজী। তিনিও চলে গেছেন। এখন নতুন ম্যানেজার এসেছেন—ইয়াং ম্যান : এস. আচার্য !'

'ও—আলাপ করে যাব।'

'যাবেন। আপনাকে তো ঐ উপাধ্যায়-সাহেবই ইন্ট্রোডিউস্ করিয়ে দিয়েছিলেন, তাই না, সাক্সেনা-সা'ব ?'

মুরলী জবাবটা এড়িয়ে যাবার জন্যে বলল, 'এটা কি আজকের কাগজ ? একটু দেখব ?'

'হ্যাঁ, আজকেরই। দেখুন না....না, না, তার দরকার হবে না। ঐ দেখুন, ওঁরা ওপরে উঠে আসছেন।'

সুসজ্জিত এক মারওয়াড়ী ভদ্রমহিলা এবং নিঃসন্দেহে তাঁর স্যুটেড-বুটেড কর্তা ওপরে উঠে এলেন। সিঁড়িভাঙার পরিশ্রমে দুজনেই হাঁপাচ্ছেন। এই করণিকের দিকে মিষ্টি হেসে হেলেদুলে যুগলে চলে গেলেন।

দাড়িওআলা রেজিস্টার খাতাখানা বাড়িয়ে ধরে বললে, 'আপনার ভল্ট নম্বর যেন কত, সাক্সেনা-সা'ব ? টু—হান্ড্রেড টেন ?'

রীতিমতো বিস্মিত হল মুরলী। দু-তিন মাসের মধ্যে এই লকারটা খুলতে সে আসে-কী-আসে না। নম্বরটা ওর নিজেরই মনে থাকে না। অথচ দাড়িওয়ালা লোকটা শুধু ওর নাম নয়, চাবির নম্বরটা পর্যন্ত মনে রেখেছে ! লোকটার স্মৃতিশক্তি তো অসাধারণ !

ওয়ালেট বার করে চাবিটা বাড়িয়ে ধরে বলে 'হ্যাঁ ; দুশো দশ।'

ওর পাতাটা মেলে ধরে লোকটা বলে, 'দেখুন সাক্সেনা-সা'ব। তিন বছরে পরপর এগারো বার আপনি এসেছেন লকার খুলতে। মিসেস্ একবারও আসেননি। অথচ আপনাদের জয়েন্ট-লকার !'

'তাতে কী হল ?'

'না, হয়নি কিছু। এতে লোকের সন্দেহ হতে পারে—লকারটার জয়েন্ট ব্যবহার হচ্ছে না। যদিও জয়েন্ট নামে আছে—'

'তাতেই বা কী হল ? হ্যাঁ, লকারটা আমি একাই ব্যবহার করি। কিন্তু আমার ভালমন্দ কিছু হলে, হঠাৎ হস্‌পিটালাইজড্ হলে যাতে মিসেস্ সাক্সেনা

এসে লকারটা খুলতে পারেন, তাতেই জয়েন্ট নাম। এতে ব্যাঙ্কের আপত্তি কিসের ?'

'না, না, এতে ব্যাঙ্কের আপত্তি হবে কেন ? নিন সই করুন।'

মুরলী কলমটা বাগিয়ে ধরে প্রশ্ন করে, 'আপনার নামটা যেন কী ? ঠিক মনে আসছে না।'

দাড়িওয়ালা হাসতে হাসতে বলে, 'এই দেখুন, স্যার, আমি আপনার নাম, ভল্টের 'কী'-নম্বর পর্যন্ত মনে রেখেছি অথচ আপনি আমার নামটাও ভুলে গেছেন। আমার নাম সতীশ জানা। আসুন।'

মুরলী খাতায় সাক্সেনার অভ্যস্ত স্বাক্ষর করে সতীশের পিছু পিছু নেমে এল আন্ডারগ্রাউন্ড ভল্ট-চেম্বারে। সতীশ গলিপথে আগে-আগে এগিয়ে এসে দুশো দশ নম্বর লকারের ফার্স্ট-কী খুলে দিল। মুরলী পাশ দিল। সরু গলি পথ। পাশাপাশি দুজনে হাঁটতে পারে না। সতীশ মুরলীকে কাটিয়ে নির্গমন দ্বারের দিকে চলে গেল। এবার টুলটা টেনে নিল মুরলী। তার ওপর ব্রিফকেসটা রেখে ডালাটা খুলে ফেলে। চাবি লাগিয়ে ওর ভল্টটাও খুলে ফেলে। ভল্টের খোপটা প্রায় ভর্তি। ঠাশাঠাশি ক্যাশ-টাকায়। এখন মনে হচ্ছে দশ-বিশ টাকার নোট চেয়ে আনা বোকামি হয়েছে।

যা-হোক, পরে ওগুলো বদলে নিলেই চলবে।

আপন মনে ঠেশে-ঠেশে নোটের বান্ডিল ঢোকাচ্ছে। সিলিং-ফ্যানের একটা বোঁ-বোঁ শব্দ ছাড়া চরাচর নিস্তব্ধ। হঠাৎ একটু দূর থেকে কে-ওকে ডেকে উঠল : 'প্যাটেল-সা'ব ?'

চমকে উঠেছে ঠিকই, কিন্তু বুদ্ধিভ্রংশ হয়নি। ঘুরে দাঁড়ায় লোকটার মুখোমুখি। দেখে নির্গমনদ্বারের কাছে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে সতীশ জানা। মুরলী বলে, 'ও! আপনি! এখনো যাননি বুঝি ? তা আমাকে 'প্যাটেল-সা'ব' বলে ডাকলেন যে হঠাৎ ?'

সতীশ এগিয়ে এল। মুরলী ভল্টের পাল্লাটা ভেজিয়ে দিল। বাঁ-হাতে ঠেলে বন্ধ করে দিল ব্রিফকেসটা। সতীশ জানা তিন হাত দূরত্বে এসে বললে, 'সাক্সেনা-সা'ব! আপনার কোনও যমজ ভাই আছেন ?'

'যমজ ভাই ? না! কেন বলুন তো ?'

'আপনাকে দেখতে হুবহু আগারওয়াল ইন্ডাসট্রিজের ম্যানেজিং ডাইরেক্টার এম. ডি. প্যাটেলের মতো।'

স্টেডি! মুরলী স্টেডি! গলা যেন একটুও না কাঁপে!

হাসি-হাসি মুখে বললে, 'তাই বুঝি ? এ অফিসে এ পর্যন্ত আর কার কার তা মনে হয়েছে ?'

সতীশ জানাও হাসি-হাসি মুখে বললে, 'বলছি। তার আগে ঐ বিশটাকার বান্ডিলটা এদিকে কাইন্ডলি এগিয়ে দেবেন, সাক্সেনা-সা'ব ?'

মুরলী নির্লিপ্তভাবে নোটের বান্ডিলটা ছুঁড়ে দিল। সতীশ জানা সেকেন্ড স্লিপে ভাল ফিল্ডার ছিল নিশ্চয়। ঠিক মত লুফে নিয়ে হিপ্ পকেটে পুরে ফেলল বান্ডিলটা। পাঁচশ টাকার। বলল, 'আর কেউ জানে না। স্রেফ আমি একাই।'

'—কী করে বুঝলে যে, আমার সঙ্গে ঐ প্যাটেল-সাহেবের চোহারার দারুণ সাদৃশ্য ?'

ক্যাচটা যখন লুফতে পেরেছে তখন ওকে 'তুমি' সম্বোধন করতে কোন সঙ্কোচ হল না। সতীশ জানাও সেটা মেনে নিয়ে বললে, 'আমার শালা ঐ আগারওয়ালা ইন্ডাসট্রিজে চাকরি করে। একদিন তার সঙ্গে আপনাদের অফিসে দেখা করতে গেছিলাম। সে সময় লিফ্টের সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন ওদের ম্যানেজিং ডাইরেক্টার, মুরলীধর প্যাটেল। শালা দূর থেকে চিনিয়ে দিল। কী বলব ? হুবহু আপনার মতো দেখতে, সাক্সেনা-সা'ব।'

'কী নাম তোমার শালার ?'

'কী দরকার স্যার, সেসব ছেঁদোকথায় ? সে-শালা তো শুধু এম. ডি. প্যাটেলকেই চেনে। রাকেশ সাক্সেনা সা'বকে তো চেনে না। খরচ বাড়িয়ে লাভ কী ?'

'তা বটে। তার মানে তুমি ভরসা দিচ্ছ তো ? এখানকার ভল্টটা বন্ধ করে দিতে হবে না ?'

'আজ্ঞে না। উপাধ্যায় বদলি হন্‌নি। পটল তুলেছেন। এ ব্যাঙ্কে আর কেউ জানে না যে, আপনি রাকেশ সাক্সেনা নন। তবে স্যার, ব্র্যাঞ্চে পদধূলি দিতে যখন আসবেন, আমিই তো আসব চাবি খুলে দিতে, দেখবেন, ক্লোজ ফিল্ডিং-এ ক্যাচ লোফার অভ্যাসটা যেন একেবারে না চলে যায়। এই আর কি।'

'ঠিক আছে। তুমি এবার ওপরে যাও।'

'যাচ্ছি স্যার, যাচ্ছি। 'ওপরে' বললেন তো ? 'ওপারে' নয় ? মানে আপনাদের তো আবার নানান মস্তানের সঙ্গেও কারবার থাকে। হাঙ্গামা যারা করে ওরা তাদের অ্যাক্‌কেরে হাফিজ করে দেয়। তেমন কোন আশঙ্কা নেই তো, স্যার ?'

'না নেই। বাড়াবাড়ি কর না। তাহলেই হল। আমি যখনই ব্যাট ধরব, সেকেন্ড স্লিপে একটা ক্যাচ উঠবে! খুশি তো?'

একগাল হেসে সতীশ বলল, 'ইয়েস, স্যার। ইচ্ছে করলে আমার ইন্‌ট্রোডাকশনে আরও একটা জয়েন্ট-লকার খুলতে পারেন। এখনো পাওয়া যাচ্ছে। ঐ নম্বরের ডবল নম্বরে!'

'ডবল নম্বার! মানে?'

'স্যার, এখন আপনার লকার নাম্বার দুশ দশ। ডবল নম্বর কত হবে নিজেই হিসেব জুড়ে নিন! আসি, স্যার!'

সিঁড়ি বেয়ে লোকটা ওপরে উঠে গেল।

॥ পাঁচ ॥

বেলা দুটো দশ।

তবু রাস্তায় গাড়ির কী ভিড়! ক্রমাগত আসছে আর যাচ্ছে। বাস, মিনিবাস, প্রাইভেট, টেম্পো, রিক্‌শা আর এই দুপুরবেলা ঝাঁক বাঁধা লরি। তবু ট্যাক্সি পাওয়া গেল একটা।

'কোন দিকে যাবেন স্যার?'

এই হচ্ছে শহর কল্লোলিনী কলকাতা। তামা-তুলসী-গঙ্গাজল হাতে গন্তব্যস্থল কবুল না করা পর্যন্ত খালি ট্যাক্সির ডালায় হাত দিতে পারবে না। ট্যাক্সি-ড্রাইভার—যে দিকে যেতে ইচ্ছুক ঘটনাচক্রে সে দিকে যদি তোমার গতিমুখ হয়, তবে সে ভাড়ার বিনিময়ে তোমাকে একটা লিফ্‌ট দেবে। তোমার গন্তব্যস্থল তার পছন্দসই না হলেই 'গাড়িটা খারাপ আছে, স্যার।'

ভাগ্যক্রমে ট্যাক্সি-ড্রাইভার ডালহৌসি-মুখো সওয়ারি ওঠাতে আপত্তি করল না। এম. ডি'র হাতে এখন একটা খালি ব্রিফকেস। খালি ঠিক নয়, ওর গর্ভে আছে তার ওয়ালেট, কলম আর একটা হাজার টাকার বান্ডিল। পাঁচশো খেয়েছে জানা, বাকি সাড়ে আট ঢুকিয়েছে সাক্সেনার নামাঙ্কিত ভল্টে। এত দিন ধারণা ছিল, মিসেস্ সাক্সেনার পরিচয়ে ডরোথি ছাড়া তথ্যটা জানা আছে শুধু উপাধ্যায়ের; এখন জানা গেল উপাধ্যায় ফৌত হয়েছে। তার বদলে তথ্যটা এখন জানা আছে জানার।

ওর গন্তব্যস্থল লিট্‌ল্ রাসেল স্ট্রিট। কিন্তু সেখানে যাবার আগে একটা ফোন করে নেওয়া দরকার। কে জানে আগে থেকেই আর কেউ অকুস্থলে হাজির কি না। এদিকে পেটে ইঁদুরে ডন দিচ্ছে। আহা বেচারি অসীমা। জেদাজেদি করে নিজেও কিছু খেল না। ওকেও লাঞ্চ খেতে দিল না।

'এই রোখ্‌কে।'

ট্যাক্সিওয়ালা রুখে ওঠে, 'তবে যে তখন বললেন, ডালহৌসী যাবেন? এটা তো পার্ক স্ট্রিট?'

'না বাবা। তা বলিনি। বলেছিলাম, ড্যালহৌসী-মুখো যাব। তাই তো এসেছি। এই নাও। ঠিক আছে, ভাঙানি দিতে হবে না।'

ড্রাইভার জবাবে যা বলতে যাচ্ছিল সেটা টপ করে গিলে ফেলল। ওর ভাড়া উঠেছিল তের টাকা। তার মানে সাত টাকা টিপ্‌স্! হাত বাড়িয়ে পিছনের পাল্লাটা খুলে দিল সে। বিশ টাকার নোটখানা কপালে ছুঁইয়ে পকেটজাত করতে করতে।

মুরলী 'পিটার-ক্যাটে' দ্বিতলে উঠে একটা ফাঁকা টেবিলে গিয়ে বসল। লাঞ্চ-আওয়ার্স শেষ হয়ে আসছে। ভিড় কমছে। একজন স্টুয়ার্ড এগিয়ে এল নোটবই হাতে।

'গুড আফটারনুন, স্যার।'

এম. ডি. অর্ডার দিল, চিকেন-অ্যাসপ্যারাগাস স্যুপ, তন্দুরী-চিকেন আর—ঐ সঙ্গে একপ্লেট স্যালাড।

'এনি ড্রিংকস্, স্যার?'

এম. ডি. ঘড়ির দিকে তাকালো। দুটো বেজে পঁয়ত্রিশ। ওর ইন্টারভিয়ু সন্ধে ছয়টায়। সাড়ে তিন ঘণ্টার মার্জিন। বললে, 'স্যুপটা খাওয়া হয়ে গেলে একপেগ হোয়াইট রাম আর সিট্রা, বরফ দিয়ে।'

'এনি ডেসার্ট, স্যার?'

'নো থ্যাংস্। কিন্তু খাবারটা সার্ভ করার আগে একটা টেলিফোন করতে চাই। কোথা থেকে করব?'

'প্লিজ ফলো মি, স্যার!'

সব কথায় 'স্যার' বলে কেন, স্কুলের ছাত্রদের মতো?

সাতটা নাম্বার ডায়াল করা শেষ হলে ও-প্রান্তে রিঙিং টোন। একটি মহিলা তুলে প্রথমেই নিজের নাম্বারটা ঘোষণা করলেন। তারপর জানতে চাইলেন, 'কাকে খুঁজছেন?'

'মিস চম্পাকে। উনি আমার কল এক্সপেক্ট্ করছেন।'

'কী নাম বলব তাঁকে?'

'এম. থ্রি। এম ফর মাদ্রাজ।'

'প্লিজ হোল্ড অন।'

একটা নিস্তব্ধতা। তার ফাঁকে ফাঁকে একটা অ্যালসেশিয়ানের গর্জনের

সঙ্গে মার্কিন মিউজিক। ককটেলটা থামল একটু পরেই চম্পার কণ্ঠস্বরে, 'এই! তুমি তো আচ্ছা! বলেছিলে, দেড়টা পর্যন্ত অফিসে থাকবে। ওখানেই লাঞ্চ সারবে। একটা না বাজতেই বেরিয়ে পড়েছ যে?'

'না! আমি তো একটা পর্যন্ত অফিসে ছিলাম। তা তুমি কি অফিসে ফোন করেছিলে? কেন?'

'তোমাকে এখন আসতে বারণ করব বলে।'

'গুড গড! কেন? তুমি না বলেছিলে তিনটে থেকে চারটে পর্যন্ত আমার জন্য ফ্রি রাখবে?'

'বলেছিলাম! আই অ্যাডমিট। কিন্তু আজ সকালেই সব আপ্‌সেট হয়ে গেল। তুমি তো জানই, একসঙ্গে তিনটে ছবিতে কাজ করছি আমি। কো-আর্টিস্টদের সঙ্গে টাইম সিনক্রোনাইজ করাই বখেড়া। সকালে প্রডাকশান ম্যানেজার ফোন করে বললেন, আজ বিকালেই একটা আউটডোর কাজ আছে। সকাল থেকেই শুটিং চলছে। এ সিকোয়েন্সে আমি ছিলাম না, তাই আমার ডেট ছিল না। এখন নাকি পরিচালক চাইছেন, আমাকে একবার অ্যাপিয়ার হতে হবে। পাঁচ-সাত সেকেন্ডের জন্যে। কোন মানে হয়? অবশ্য ওরা ফুল-ডে চার্জ দেবে।'

'তবে আর কী? ফুল-ডে চার্জ দিয়ে মাথাটা কিনে নিয়েছে। আমি তাহলে এখন কী করি? আমার নেক্সড অ্যাপয়েন্টমেন্ট তাজ-বেঙ্গলে সন্ধ্যা ছয়টায়। ভেরি ভেরি ক্রুশিয়াল ইন্টারভ্যু। তাই দুপুরে তোমার সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করেছিলাম! মনটা প্রফুল্ল রাখতে চাই, মাথাটা ঠাণ্ডা! তোমার সঙ্গে দুপুরটা থাকলে যা হত। এখন এই তিন-সাড়ে-তিন ঘণ্টা আমি কী করি?'

'আমার একটা ছোট্ট সাজেশন শুনবে?'

'না, শুনব না। তোমার ঐ ছবিটা তো? ম্যাটিনিতে আবার দেখা! সে আমি পারব না। ও ছবি তিনবার দেখেছি।'

'না গো, ছবি দেখতে বলছি না।'

'তবে কী?'

'ফর এ চেঞ্জ, হোয়াই নট বি আ নূন-ডে-কিং?'

'নূন ডে কিং! তার মানে?'

'তোমার গিন্নির নাম তো রানী। কর্তা অফিসে, মেয়ে স্কুলে। সে সারা দুপুর কী করে? পড়ে পড়ে ঘুমায়? মোটা হয়ে যাবে না?'

'নিশ্চয় ঘুমায় না। মোটা হয়ে তো যায়নি—'

'সে তো আরও ভয়াবহ কথা ! তাহলে তুমি যেমন অফিস পালিয়ে ভর দুপুরে চম্পা-বাগানে ফুল তুলতে আস, তেমনি অন্য কেউ অফিস পালিয়ে রানীমহলে রাজা সাজতে যায় না তো ?....ও, আয়াম সরি ! আমার গাড়ি এসে গেছে.....হর্ন দিচ্ছে। বাঈ...'

ও-প্রান্তে টেলিফোনটা ক্র্যাডলে ফিরে গেল।

এ-পাড়ায় চিকেন-অ্যাসপ্যারাগাসের স্যুপ চীনেমাটির বাউলে এসে নামল ওর টেবিলে।

মুরলী টেবিলে এসে বসল। স্যুপটা প্রচণ্ড গরম। একটু ঠাণ্ডা হ'ক। ভিনিগার আর সয়াসস্ মিশিয়ে একটু অপেক্ষা করতে বসল। চম্পার চটুল রসিকতায় ওর মস্তিষ্কে স্মৃতিকোষের একটা ছোট্ট ফোকর খুলে গেল হঠাৎ। মনে পড়ে গেল, কদিন আগে মামণির সেই অদ্ভুত 'গোপন কথাটা'।

শিশু-মনস্তাত্ত্বিকেরা বলেন, বাচ্চারা যদি বিশ্বাস করে তোমাকে কোনও 'গোপন কথা' জানায়—তা যতই 'আবোল-তাবোল' বা 'হযবরল' হোক, সেটা গোপন রাখা উচিত। শিশু যদি জানতে পারে যে, তার গোপনীয়তা রক্ষিত হয়নি, তখন তার আস্থা হারিয়ে যায়। বয়ঃসন্ধিকালে তখন তারা সত্যিকারের গোপন কথা বাবা বা মাকে জানাতে ভরসা পায় না। তাই মামণির সেই আজগুবি কথাটা মুরলী তার স্ত্রীকেও জানায়নি। এতদিনে ওর সেই ছেলেমানুষি-কথাটা ভুলেই গেছিল।

মামণির বয়স কত হল ? পাঁচ ? না, ছয়ে পড়েছে এবার। স্কুলের বাসে যাতায়াত করে। এগারোটা থেকে চারটে। মামণি কদিন আগে বলেছিল, 'বাপি, তোমাকে একটা কথা বলব, তুমি কারুক্ষে বলবে না, কথা দাও !'

'কী এমন কথা ?'

'আগে প্রমিস্ কর ?'

'অল রাইট ! আই প্রমিস্।'

'মাম্মিকেও নয় ?'

'নিশ্চয় নয়। 'কারুক্ষে' বলতে তো মাম্মি ইনক্লুডেড, তাই নয় ?'

'মাম্মি তো কত্ত বলে-বলে-বলে তবে তোমাকে স্মোকিং করা ছাড়িয়েছে ? স্মোক করলে হার্ট-অ্যাটাক হয়, ক্যান্সার হয়, তাই তো ?'

মুরলী অবাক হয়ে শুনছিল। এ যুগের ছয় বছরের বাচ্চা কী পাকা-পাকা কথা বলে ! ওরা 'স্মোকিং' বোঝে, 'হার্ট-অ্যাটাক' বোঝে, মায় 'ক্যান্সারও' বোঝে !

'বল না বাপি ? তাই হয় তো ?'

'তাই তো শুনেছি।'

'আর তোমাকে স্মোকিং ছাড়িয়ে মাম্মি কী করছে জান ? নিজেই স্মোকিং ধরেছে। এখন বোঝ ঠ্যালা !'

মুরলী কোন রকমে হাসির দমক সামলে বলে, 'তবে তো সত্যিই ভারি মুশকিল হল। এবার আমাকেই কত্ত বলে-বলে-বলে তোমার মাম্মির স্মোকিং ছাড়াতে হবে।'

'তা তো হবেই। তবে এখনি নয়। দুদিন সবুর কর। না হল—মাম্মি যেমন সন্দেহবাতিক—ঠিক বুঝে ফেলবে, আমি লাগানি-ভাগানি করেছি।'

মুরলী জানতে চেয়েছিল, 'তুমি কি দেখেছ মাম্মিকে সিগ্রেট খেতে। মিসেস্ খাণ্ডেলওয়ালার মতো ?'

না, তা দেখেনি মামণি। তবে বেশ কিছুদিন ধরে মাঝে মাঝেই স্কুল থেকে ফিরে এসে মাম্মির শোবার ঘরে কেমন যেন 'বাপি-বাপি' গন্ধ পায়। প্রথমটা তার হেতু ঐ ছয় বৎসরের মামণি বুঝে উঠতে পারেনি। তারপর ও বুঝেছিল, মাম্মি লাঞ্চের পর—ঠিক বাপি আগে-যেমন-করত-তেমনি স্মোকিং করে। মামণি স্কুল থেকে ফিরে আসার আগেই সিগ্রেটটা ফেলে দেয় ; কিন্তু ঘরে সেই 'বাপি-বাপি-গন্ধ'-টা লেগেই থাকে। মামণি সনির্বন্ধ অনুরোধ করেছিল প্রসঙ্গটা দু-চার দিন পরে তুলতে। না হলে মাম্মি ভাববে মামণিই লাগানি-ভাগানি করেছে। মুরলী স্বীকৃত হয়েছিল। তারপর স্রেফ ভুলে গেছে। আজ চম্পার ঐ অশ্লীল রসিকতায় ওর হঠাৎ মনে হল....

আরও মনে পড়ে গেল একটা ছোট্ট ঘটনা। এই তো দিন-তিনেক আগে। হঠাৎ ওর শয়নকক্ষে আবিষ্কার করল আশট্রেতে গোটা-চারেক সিগ্রেটের স্টাম্প। মুরলী বছরখানেক আগে ধূমপানের অভ্যাস ত্যাগ করেছে। ওদের শয়নকক্ষে আজকাল অ্যাশট্রে থাকেই না। তাই একটু অবাক হয়ে বলেছিল, 'এ আবার কী ?'

রানী হাসতে হাসতে বলেছিল, 'দুপুরে মিসেস্ খাণ্ডেলওয়ালা এসেছিল। উঃ ! কী স্মোকিংই করে। একটার পর একটা ধরাচ্ছিল ! আমার তো রীতিমতো গা গুলাচ্ছিল।'

'তা ওকে বেডরুমে নিয়ে আসার কী দরকার ?'

'আমি এনেছি থোড়াই ! ও তো ঘরের লোকের মতো আমার পিছু পিছু সারা বাড়ি ঘুরে বেড়াচ্ছিল...'

ইতিমধ্যে বেয়ারা এসে উপস্থিত। একহাতে হোয়াইট রাম অপর হাতে

সিট্রার না-খোলা-বোতল। এসেই অপ্রস্তুত হয়ে যায়। বলে, 'সরি, আপনার স্যুপ খাওয়া হয়নি দেখছি। তাহলে পরে আনব। একসঙ্গে গরম-আর ঠাণ্ডা....'

এম. ডি. বলল, 'না, স্যুপটা নিয়ে যাও। খাব না। ড্রিংসটা সার্ভ কর।'

লোকটা হোয়াইট রামের গ্লাসে বরফ আর কিছুটা সিট্রা ঢেলে অভুক্ত স্যুপটা উঠিয়ে নিয়ে গেল। মুরলীধর ঘড়িটা দেখল। ঠিক তিনটে। পকেট থেকে ডায়েরিটা বার করে পেয়ে গেল খাণ্ডেলওয়ালার রেসিডেন্স নম্বর।

ড্রিংসের গ্লাসটা পড়ে রইল টেবিলে। গট্‌গট্‌ করে ও এগিয়ে গেল কাউন্টারের দিকে।

'—ইয়েস, স্যার ? হোয়াট ক্যানাই....'

'আর একটা টেলিফোন করব।'

'য়ু আর ওয়েলকাম।'

সাতটা নম্বর ডায়াল করতেই ও-প্রান্তে রিঙিং টোন। মুরলী ইতিমধ্যে মনস্থির করেছে ; মিসেস্‌ খাণ্ডেলওয়ালা ধরলে বলবে, 'রানী বলছিল, আপনি অনেক দিন আসেন না, একটু খবর নিতে। আপনারা ভাল আছেন তো ?' দুটো রিয়্যাকশন হতে পারে। মিসেস্‌ খাণ্ডেলওয়ালা যদি দিন-তিনেক আগে না এসে থাকেন তাহলে বলবেন, 'বেশ তো যাব একদিন। রানীকেই বলবেন একদিন আসতে। তা নিজে ফোন না করে আপনাকে দিয়ে ফোন করাচ্ছে যে ?' জবাবে জানাবে, 'বাড়ির ফোনটা সকাল থেকে ডেড হয়ে আছে। আমি অফিস থেকে বলছি।' সেকেন্ড অল্‌টার্নেটিভ, যদি উনি সত্যিই দিন-তিনেক আগে এসে থাকেন, তাহলে উনি অবাক হয়ে যাবেন! সেক্ষেত্রে....'

'হ্যালো ?' —ও-প্রান্তে সাড়া জেগেছে।

'মিস্টার কিংবা মিসেস্‌ খাণ্ডেলওয়ালা কি বাড়িতে আছেন ?'

'জী নহি। বহ্‌ বোম্বাই গয়্যে হ্যেঁ। আপ্‌ কৌন্‌ ?'

'কব ?'

'করিব সাত-আট রোজ পহিলে। আপ কৌন্‌ ?'

'মিসেস্‌ খাণ্ডেলওয়ালা ভি গয়ী হ্যাঁ ক্যা ?'

'জী হাঁ। লেকিন আপ কৌন বোল্‌ রহে হেঁ ?'

লাইনটা কেটে দিল মুরলীধর।

এবং তৎক্ষণাৎ তুলে নিজের বাড়ির নাম্বার ডায়াল করল।

একনাগাড়ে রিঙিং টোন বেজেই গেল ' কেউ তুলল না। কী হতে পারে ?

রানী বেরিয়েছে ? গাড়িটা নিয়ে ? তাহলে গৌতম কী করছে ? ঘুমাচ্ছে ? সেক্ষেত্রে নির্মলা ? বাড়িতে কেউ নেই ? তালাবন্ধ বাড়ি ?

মুরলী ফিরে এল টেবিলে। এতক্ষণে ওর খাবার আসতে শুরু করেছে। কিন্তু ওর মাথায় তখন আগুন জ্বলছে। বললে, খাবার সার্ভ করতে হবে না। যা অর্ডার করেছিল তার বিল নিয়ে আসতে। যে লোকটা সার্ভ করতে এসেছিল সে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। ও-পাশ থেকে স্টুয়ার্ড ছুটে এসে ইংরেজিতে জানতে চায়, 'কী হয়েছে স্যার ? আমাদের কোন ত্রুটি হয়েছে কি ?'

'—না, না ! টেলিফোনে এক্ষনি একটা জরুরী খবর পেলাম। খাবার সময় হবে না। যা অর্ডার করেছি তার বিল করে বাকিটা টিপ্‌স্‌ দিয়ে দেবেন।'

বলে তিনখানা একশ টাকার নোট বাড়িয়ে ধরে। লোকটা তা থেকে একটি মাত্র নোট উঠিয়ে নেয়। বলে, 'স্যুপ আর ড্রিংসটা টেবিলে সার্ভ করা হয়েছিল। শুধু সেটুকুর দামই আপনি দেবেন। বাকি খাবারের দাম দিতে হবে না। সেগুলো আপনার টেবিলে সার্ভ করাই হয়নি। আর এ থেকেই টিপ্‌স্‌ হয় যাবে।'

মুরলীধর উঠে দাঁড়ায়। বাকি দুটো নোট তুলে নেয়। বলে, 'থ্যাংস্‌।'

'য়ূ আর ওয়েলকাম, স্যার। আপনি আজ জরুরী কাজে না খেয়ে চলে যেতে বাধ্য হলেন। 'পিটার-ক্যাট' তার 'ক্যাট-ন্যাপ' দেওয়া ত্যাগ করবে, যতদিন না আপনি আবার ফিরে আসেন।'

এম. ডি. হাসল। বলল, 'শ্যিওর ! আবার আসব তো বটেই। সবান্ধবী !'

॥ ছয় ॥

পিটার-ক্যাটের সামনেই অপেক্ষা করছিল একটা ট্যাক্সি। মিটার নামানোর আগে জানতে চাইল না সওয়ারি কোথায় যাবে। সর্দারজীর ট্যাক্সি। ওরা প্রায়শই গন্তব্য জানতে চায় না।

ট্যাক্সিটা এসে পৌঁছল হাউসিং কম্‌প্লেক্সের সামনে। আটটা দশ-তলা হাইরাইজ বিল্ডিং-এর মাঝখানে একটা উঠোন। ব্যাডমিন্টন কোর্ট। এম. ডি. ইচ্ছে করেই ট্যাক্সিটা গেটের বাইরে থামাল। মেয়েরা ব্যাডমিন্টন খেলছে। বেলা পড়েনি। তবে বাড়ির ছায়ায় রোদও নেই। মিটার দেখে ভাড়া মিটাতে মিটাতেই দেখল প্রীতম সিং তার বড় বড় পা ফেলে এগিয়ে এসে ট্যাক্সির পিছনের পাল্লাটা খুলে ধরেছে। প্রীতম সিং এক্স-মিলিটারিম্যান। দীর্ঘদেহী. সদাহাস্যময়, কমপ্লেক্সের প্রতিটি শিশুর সঙ্গে তার দিল্‌তোড়-দোস্তি।

'আইয়ে সা'ব। আজ ট্যাক্সিসে লৌটায়া? ক্যা বাত?'

মুরলীধর বলে, 'এইসাই'। তারপর ব্যাখ্যা করে বোঝায়, 'অফিস থেকে নিজের কাজে এদিক-ওদিক যেতে হয়েছিল বলে।'

প্রীতম সিং হাসল। সেও জানে—রামদীন ড্রাইভারের মতো—এম. ডি. সা'ব বিলকুল সরিফ—ইমানদার ইন্‌সান।

মুরলীধর লক্ষ্য করে দেখল, সতের নম্বর গ্যারেজের ভিতর অ্যাম্বাসাডার গাড়িখানা প্রতীক্ষারত। কেমন করে হয়? তার মানে রানী বের হয়নি? অ্যাপার্টমেন্টে আছে? তাহলে টেলিফোনটা ধরল না কেন? টেলিফোন নিশ্চয় একসঙ্গে দুঘরেই বেজেছে। ড্রয়িংরুমে এবং এক্সটেনশানে শয়নকক্ষে। বাথরুমে ছিল কি তখন? তাহলে গৌতম, অথবা নির্মলা? ড্রয়িংরুমের ফোনটা তো ওদের দুজনের মধ্যে কারও তোলা উচিত ছিল।

লিফ্‌টের গর্ভে ঢুকে বোতাম টিপতে যাবে এমন সময় ঝোলা হাতে প্রতিবেশিনী বৃদ্ধা মিসেস্ জৈন এসে হাজির, 'জারাসে রুখ্ যা, বেটা!'

'হাঁ, দাদীমা, আইয়ে!'

বোতাম টিপে লিফটের দরজাটা খুলে দিল আবার। বৃদ্ধা কিছু কিনতে গিয়েছিলেন বোধহয়। সত্তরের উপর বয়স। ঝি-চাকর সবই আছে, তবু নিজে সওদা করতে ভালবাসেন। চাকর-বাকরের চুরি ধরতে নয়, বলেন, না হলে বাতে ধরবে। বৃদ্ধা জৈন-দম্পতি ঠিক পাশের অ্যাপার্টমেন্টের বাসিন্দা। কর্তা-গিন্নি বিরাট ফ্ল্যাট নিয়ে কলকাতায় পড়ে আছেন। প্রকাণ্ড জুয়েলারীর ব্যবসা। মেয়েদের বিয়ে হয়ে গেছে। ব্যাটা-ব্যাটা বৌ বোম্বাইয়ের দোকান দেখ্‌ভাল করে। তবে মাসে দু তিন বার তত্ত্বতালাশ নিতে উড়ে আসে।

লিফটে ঊর্ধ্বগমনের অবকাশে মিসেস্ জৈন হিন্দিতে জানতে চান, 'আজ কি ছুটি নিয়েছ? না হলে এমন অসময়ে তো তোমাকে দেখি না।'

'জী নেহি দাদীমা। একটা জরুরী ফাইল নিয়ে যেতে এসেছি।'

'হায় রামজী! সেজন্যে নিজেকে 'পরিশান' করতে হল? লোক পাঠিয়ে নেওয়া গেল না?'

'নেহি দাদীমা, স্টাফ-সংক্রান্ত কন্‌ফিডেন্সিয়াল ফাইল।'

'আই সি। তা সদর দরজার চাবি আছে তো তোমার কাছে?'

'কেন? রানী বাড়িতে নেই?'

লিফ্‌টটা এসে থেমেছে ওঁদের ফ্লোরে। তাই ও-কথার জবাব না দিয়ে মিসেস্ জৈন বলেন, 'উতারো, বেটা।'

দুজনে করিডর দিয়ে পাশাপাশি চলতে থাকেন। মিসেস্ জৈন বলেন, 'ও তো এ সময় সচরাচর থাকে না। তাই বলছি।'

'ও তো এ সময় সচরাচর থাকে না!'—এ আবার কী নতুন তথ্য! গৃহস্বামী তো তা জানে না। থাকে না তবে কোথায় যায়?

দুজনে এসে পৌঁছেছেন, প্যাটেলের নামাঙ্কিত রেইজড টিক্-প্যানেল-সদর-দরজাটার সামনে। মুরলীধর ডোর বেল বাজালো না। চামড়ার কী হোল্ডার থেকে বেছে একটা চাবি বার করে লাগাল ইয়েল-লক তালায়। ক্লিক করে শব্দ হল। পাল্লা খুলে গেল। মিসেস্ জৈন দু পা এগিয়ে গিয়েছিলেন। হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে বলেন, 'বেটা!'

'জী?'

'তোমার কাজ মিটে গেলে একবার এ বাড়িতে এস তো। তোমার দাদাজী তোমাকে কী কয়েকটা কথা বলতে চান।'

ভ্রূকুঞ্চন হয় এম. ডি.-র। বলে, 'কী ব্যাপার, দাদীমা?'

'ডরো মৎ বেটা। কোই খাশ্ বাৎ নেহী। লেকিন বহুরানী—চারবাজেকা পহলেই চলি আয়েগী। উস্‌সে পহিলে....'

কথাটা অসমাপ্ত রেখেই উনি এগিয়ে যান নিজের অ্যাপার্টমেন্টের দিকে। এম. ডি. কবজির দিকে তাকাল। তিনটে বেজে কুড়ি। রানী যে চারটের আগে ফেরে তাও বুড়ি জেনে বসে আছে!

গোটা অ্যাপার্টমেন্ট ফাঁকা। গৌতম নেই, নির্মলা নেই।

গৃহস্বামিনী তো অনুপস্থিত বটেই। সর্বশেষ যে ঘর ছেড়ে বার হয়ে গেছে সে দয়া করে টেলিভিশানের সুইচটা অফ্ করে যায়নি। তাই রুদ্ধদ্বার কক্ষে টি. ভি. স্ক্রিনে এক ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি-আলা প্রফেসার ইউ. জি. সি. প্রোগ্রামে ক্যালকুলাসের মূলসূত্র ব্যাখ্যা করে চলেছেন। এয়ারকুলারটাও চলছে। ঘরটা বিলকুল ঠাণ্ডা। মুরলীধর এয়ারকুলারটা অফ্ করল। ইউ. জি. সি. প্রোগ্রামের অধ্যাপককেও ছুটি দিয়ে দিল।

এল শয়নকক্ষে। বিছানাটা লণ্ডভণ্ড! টান-টান করে পাতা নয়। চাদরটা কোঁচকানো। দুটো বালিশ মাথার দিকে, দুটো এদিকে। বেশ বোঝা যায়, এখানে দুপুরে কেউ শুয়েছে, কে বা কাহারা! টিপয়টা বিছানার কাছাকাছি। তাতে সেই বিশেষ অ্যাশট্রেটা। আর তার গর্ভে পরপুরুষ-চুম্বনধন্য দগ্ধাবশেষ গোটাচারেক সিগ্রেটের স্টাম্প।

মুরলীধর ঝপ করে বসে পড়ল একটা সোফায়!

মনে হল, তার পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যাচ্ছে। না! মুরলীধর প্রাচীনপন্থী নয়। স্ত্রী-স্বাধীনতায় বিশ্বাসী। কিন্তু 'স্ত্রী-স্বাধীনতা' বিশেষ্যপদটা যখন ক্রিয়াপদে রূপান্তরিত হয় তখন তার দুই রূপ: আত্মনেপদী এবং পরস্মৈপদী। প্যাটেল-সাহেবের ব্যাকরণে পরস্মৈপদী ক্রিয়াকলাপ অনুমোদনযোগ্য। আত্মনেপদী ধাতুতে ওর যে একটা বিকল্প ব্যবহার আদৌ হতে পারে এটা এতদিন ছিল চিন্তার বাইরে। রানু যে অন্য ধাতুতে গড়া! এটা যে অসম্ভব! আবার উঠে দাঁড়াল। পর পর চার-পাঁচটি বাড়িতে টেলিফোন করল। যে-সব বাড়িতে রানীর গাড়ি নিয়ে বেড়াতে যাবার সম্ভাবনা। আত্মীয়-বন্ধু জাতীয়। তারপর ওর খেয়াল হল, রানী তো গাড়ি নিয়ে যায়নি। সতের নম্বর গ্যারেজে ওদের ফ্যামিলি কার

তো হেডলাইটের অন্ধ দু-চোখ মেলে কবি মিল্টনের মতো সার্ভিস দিচ্ছে। 'স্ট্যান্ড অ্যান্ড ওয়েট!' তবে কি হেঁটে হেঁটে গেছে? এই দুপুর রোদে? সেক্ষেত্রে এই হাউসিং কমপ্লেক্সের অন্য কোন ফ্ল্যাটে? না, তাও নয়। কারণ তেমন-তেমন ক্ষেত্রে ফ্রিজের গায়ে যে ম্যাগনেট আছে তার নিচে কাগজ রেখে ম্যাগনেট চাপা দিয়ে যাওয়ার কথা। খবরটা জানিয়ে। এটাই ওদের দাম্পত্য জীবনের প্রচলিত রীতি। —আট-বছরের দাম্পত্য জীবনের। কী মনে হল, ফ্রিজটা খুলে দেখল। খাবার অনেক কিছুই রয়েছে। ক্ষুধাও প্রচণ্ড। কিন্তু সব খাদ্যদ্রব্যই হিমশীতল। গরম না করলে খাওয়া যাবে না। একেবারে সময় নেই হাতে। নির্মলা থাকলেও না হয়....কোথায় গেল এরা সবাই?

যা কস্মিনকালেও করে না, যা ওর ধাতে নেই, তাই করতে বসল। ওর শয়নকক্ষটাকে ঝাড়পোঁছ করা। বিছানার চাদরটা টান-টান করে পাতল। বেড-সাইড টেবিলটাকে যথাস্থানে সরিয়ে আনল। দগ্ধ সিগ্রেট-স্টাম্প পরীক্ষা করে দেখল—ইন্ডিয়া কিং, কোনটাতেও লিপ্‌স্টিকের দাগ লাগেনি—ফেলে দিয়ে এল স্কালারিতে-রাখা লিটার-বিনে। অ্যাশ্‌ট্রেটাকে সাবান দিয়ে সাফা করল ওয়াশ-বেসিনে। তোয়ালে দিয়ে মুছল। তারপর টেবিল থেকে নোট প্যাড নিয়ে একটা কাগজে গোটা-গোটা হরফে লিখল: 'মিসেস খাণ্ডেলওয়ালা দিন দশেক আগে বোম্বাই চলে গেছেন। তাঁর ধূমপানের প্রয়োজনে অ্যাশ্‌ট্রেটাকে বেডরুমে রাখার দরকার নেই।'

অ্যাশ্‌ট্রেটাকে বিছানার মাঝখানে রেখে তার উপর চিরকুটখানা রাখল এবং একটা আধুলি মানিব্যাগ থেকে নিয়ে চাপা দিল, যাতে ফ্যান খুললেও কাগজটা উড়ে না যায়।

হঠাৎ মনে পড়ে গেল, প্রতিবেশিনী বৃদ্ধার কথা, 'ও তো এ সময় সচরাচর বাড়িতে থাকে না। সদরের চাবিটা এনেছ তো?'

তার মানে একমাত্র গৃহস্বামীই অনবহিত। প্রতিবেশিনীরা জানেন ব্যাপারটা। ঠাট্টা করে যে কুৎসিত ইঙ্গিত করেছিল চম্পা! মুরলী যখন অফিসে, মামণি যখন স্কুলে, তখন আসে সেই বিশেষ ব্যক্তিটি। বসে ওদের শয়নকক্ষেই। রানু হয়তো ড্রেসিং রুমেও যায় না, ওর চোখের সামনেই পোশাক পালটায়। প্রসাধন সারে। লোকটা সিগ্রেট ধ্বংস করতে করতে রুদ্ধদ্বারকক্ষে দেখে সেই অভিসারিকার সাজবদলের পালা। হয়তো নির্মলা এবং গৌতমও ব্যাপারটা জানে। অন্তত আন্দাজ করেছে। না হলে মা দুপুরে রোজই কোন ছুতোনাতায়

ওদের গৃহছাড়া করেন কেন ? রোজই ? কে জানে।

ফ্রিজ থেকে ঠাণ্ডা জলের বোতল বার করে ঢক্‌ঢক্‌ করে অনেকটা জল খেল খালি পেটে। বোতল থেকেই। গ্লাসে ঢালতে সবুর সইল না। আবার দেখল ঘড়িটা। তিনটে বত্রিশ। তার মানে দু-মিনিট আগে মামণির ছুটি হয়েছে। আর আধঘণ্টার মধ্যেই সে এসে যাবে। তার আগে নিশ্চয় ফিরে আসবে মামণির মা। মিসেস জৈন সেই আশঙ্কার কথাই বলেছিলেন।

হাতে সময় খুব কম। রানী ফিরে আসার আগে ওকে এই অভিশপ্ত অ্যাপার্টমেন্ট ছেড়ে বেরিয়ে পড়তে হবে। মুখোমুখি দেখা হয়ে যাওয়া মানেই অনিবার্য 'শো ডাউন'। তারপর ঠাণ্ডা মেজাজে ইন্টারভিয়ু দিতে যাবার প্রশ্নই হয় তো উঠবে না। কিন্তু সারা দিনে ওর গেঞ্জি-ড্রয়ার ভিজে শপশপে, শার্টের কাফ লিংকে ময়লা লেগেছে। কোন স্যুটটা পরে ইন্টারভিয়ু দিতে যাবে তা স্থির করাই আছে। আলমারি খুলে বার করে স্যুটটা, টেরেলিনের শার্ট, গেঞ্জি, রুমাল, ড্রয়ার। তারপর জামা-কাপড় খুলে ধপাস্‌-ধপাস ফেলতে থাকে ডিভানটার ওপর। সদর দরজায় ইয়েল-লক লাগানোই আছে। ডুপ্লিকেট চাবি একমাত্র রানীর কাছে।

মাতৃগর্ভ থেকে যে বেশে দুনিয়াদারী করতে এসেছিল সেই আদিম বেশে ঢুকে গেল সংলগ্ন বাথরুমে। শাওয়ারটা খুলে দিল। বাথটাবে দাঁড়িয়ে। প্রতিবর্তী প্রেরণায় পলিথিনের স্ক্রিনটা টেনে দিয়েছে, যাতে স্নানাগারের বাকি অংশ ভিজে না যায়।

সাত মিনিটেই স্নান সারা।

শেভিং সকালেই করা আছে। তবু আর একবার ইলেকট্রিক রেজারটা গালের উপর বুলিয়ে নিল। ফরাসী ভাষায় একটা প্রবাদ আছে : দিনে দুবার শেভ করবে না। তাতে গালের চামড়া খশ্‌খশে হয়ে যায়। এ নিয়মের দুটি ব্যতিক্রম। এক : যদি কোন কুইন বা কন্টেসেনার আমন্ত্রণ রক্ষা করতে যেতে হয়। দুই : যদি পরস্ত্রীকাতরতায় স্বীকার হয়ে কাউকে সিডিউস্‌ করতে যাও ! তৃতীয় বিকল্পের কথাটা বলা হয়নি : চাকরির ইন্টারভ্যু। তোয়ালে দিয়ে গা মুছে ভাল করে সর্বাঙ্গে ওল্ড-স্পাইস্‌ পাউডার ছড়ালো। তারপর বাথ-টাওয়েলে পা মুছে ফিরে এল শয়নকক্ষে। অত্যন্ত দ্রুতছন্দে পাটভাঙা প্যান্ট-শার্ট, কোট-টাই পরিধান করল একে একে। ব্রিফকেস থেকে ওয়ালেটটা বার করে ভরে নিল কোটের ইনসাইড পকেটে। আর হাজার টাকার নোটের বান্ডিলটা তুলে রাখল লোহার আলমারির

সিক্রেট-ড্রয়ারে। হাতঘড়িটা বাম মণিবন্ধে পরার সময় নজর হল : তিনটে বেয়াল্লিশ।

যে-কোন মুহূর্তে রানী ফিরে আসতে পারে। এলে একাই আসবে—তার 'নূন-ডে-কিং'-কে নিয়ে বাড়িতে ফিরবে না নিশ্চয়। কারণ রানী জানে, আর মিনিট-পনেরোর মধ্যে মামণির স্কুল-বাস এসে যাবে।

সয়েল্‌ড লিনেন ছড়ানো থাকল ডিভানে, কার্পেটে।

মুরলী দ্রুত পায়ে চলে এল ড্রইংরুমে। চটিটা খুলে মোজা জুতো পরে নিল। একবার পকেটটা বাজিয়ে দেখল রুমাল, চিরুনি, পার্স, বাড়ি-গাড়ির চাবি সব ঠিক ঠিক আছে কি না। তারপর বেরিয়ে এল সদর পার হয়ে করিডরে। টেনে ইয়েল-লকটা বন্ধ করে দিল।

তখনই মনে পড়ল কথাটা।

মিসেস্ জৈন বলেছিলেন, দাদাজী ওকে কী যেন বলতে চান।

ওর ইন্টারভিয় ছয়টায়। এখান থেকে তাজ-বেঙ্গল যেতে, রাস্তা ফাঁকা পেলে দশ মিনিট—অফিস ফেরত জ্যামে পড়লে, আধঘণ্টা। ওর হাতে এখনো পাক্কা দু-ঘণ্টা। সময়ের অভাব নেই। অসুবিধা দুটো। এক : যদি রানীর সঙ্গে মুখোমুখি দেখা হয়ে যায়। যায় তো যায়! অত ভয় পাওয়ার কী আছে? পরিচিত মানুষকে দেখলে মানুষ যা করে তাই করবে। বলবে, 'হাই! যাও বাড়ি যাও। মামণি এখনি আসবে!' কোন কথা-কাটাকাটির সুযোগই দেবে না। দুই : দাদাজী যদি রানীর মধ্যাহ্ন-অভিসারের প্রসঙ্গেই কিছু বলতে শুরু করেন। তখন ও বলবে, 'দাদাজী, আজ সন্ধ্যাবেলায় আমার একটা ভারী বিজনেস-কন্ট্রাক্ট-এর টার্মস্ ঠিক করার কথা। এখন মাথাটা ঠাণ্ডা রাখতে চাই। ফিরে এসে শুনব।'

অশীতিপর জুয়েলার জৈন-সাহেব চাকরির ইন্টারভিয়ুর গুরুত্ব সম্বন্ধে অনবহিত হতে পারেন, কিন্তু বিজ্‌নেস-কন্ট্রাক্টের ব্যাপারে মাথা ঠাণ্ডা রাখার কথা উনি ভালই বুঝবেন।

পাশের দরজায় বেল বাজাতেই সেটা সঙ্গে সঙ্গে খুলে গেল।

মিসেস্ জৈন ওকে আহ্বান করলেন ভিতরে, 'আস্নান তো করে নিয়েছিস্ দেখছি, নাস্তা কিছু জোটেনি নিশ্চয়। ঘরওয়ালী ঘরে না থাকলে যা হয়। যা, বুড়ো ঐ ঘরে আছে। গাজরের হালুয়া বানিয়েছি আর নামকিন। নিয়ে আসছি। চা খাবি, না ঠাণ্ডাই? কোন্‌টা তোর মনপসন্দ?'

'ঠাণ্ডাই খাব দিদা। তোমার হাতের ঠাণ্ডাই যা হয়!'

বৃদ্ধা ওর কাঁধে একখানা হাত রেখে বলেন, 'তা তো হয়। কিন্তু কার ওপর রাগ করে লাঞ্চটা খেলি না ?'

বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গেল মুরলীধর। বলল, 'দুপুরে আমি লাঞ্চ খাইনি ? তুমি কেমন করে জানলে ?'

'খুব সহজে। তিনটে মেয়ে আর একটা ছেলে পেটে ধরে। বাচ্চাদের খিদে পেলে 'বদন'খানা কেমন হয় তা বুঝব না ?'

ভাগ্যে ওর অফিসের কেউ উপস্থিত নেই। প্রবলপ্রতাপশালী এম. ডি. প্যাটেল এম. ডি. কে কেউ 'বাচ্চা ছেলে' বলছে শুনলে তারা বোধ করি ভিরমি খেত।

পাশের ঘরে প্রকাণ্ড বড় বিছানার একটা কোণ দখল করে অর্ধশয়নে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন বৃদ্ধ জৈন-সাহেব। পিঠের দিকে তিন-চারটে বালিশ ঠেশ্ দেওয়া। বললেন, 'আ-যা বেটা। বৈঠ যা।'

মুরলীধর চেয়ার টেনে নিয়ে সামনে এসে বসল এবং তিনি মুখ খোলার আগেই প্রথম ডীলে রঙের টেক্কাটি পেড়ে লীড দিল : 'দাদাজী, আজ সন্ধ্যায় একটা বহুৎ-ভারী বিজনেস্ ডীল হবে—বলতে পারেন জীবন-মরণ সমস্যা—তাই তৈরি হয়ে বের হচ্ছি। আপনার যা বক্তব্য তা কাল সকাল পর্যন্ত মুলতুবি রাখা সম্ভব হলে আমি কাল সকালে আর একবার আসতাম।'

জবাবে বৃদ্ধ একেবারে অন্য এক গল্প ফাঁদলেন, 'সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল তোর কেউ হন ?'

'জী না।'

'খ্যয়ের তিনিও প্যাটেল, তুইও প্যাটেল, সহি বাৎ হ্যয়, ইয়া নহী ?'

'জী বাৎ তো সহি হ্যয় !'

'তব্ শুন লে....'

বৃদ্ধ বলে গেলেন সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের জীবনের এক খণ্ড-কাহিনী। তখনো তিনি সর্বভারতীয় খ্যাতি অর্জন করেননি। আহ্মেদাবাদের কোর্টে ওকালতি করতেন। একটা খুনের মামলায় ঐ হাইকোর্টে প্রতিবাদীর তরফে শেষ সওয়াল সাম-আপ করছেন। ওঁর জুনিয়ার হঠাৎ সর্দারজীর কোটের আস্তিন ধরে টানল। প্যাটেল বক্তৃতা থামিয়ে ঘুরে দাঁড়ালেন। প্রশ্ন করলেন : ক্যা বাত ?

'আপনার বাড়ি থেকে একটা আর্জেন্ট টেলিগ্রাম এসেছে ভকিলজী।'

- বল্লভভাই বিচারকের দিকে ফিরে বললেন, 'এক্সকিউজ মি. মি লর্ড ! আমি

একটা তারবার্তা পেয়েছি। সেটা পড়ে নিয়েই ফের সওয়াল শুরু করব....'

জাজ বললেন, 'অলরাইট !'

একলাইনের চিরকুট। পড়ে নিয়ে টেলিগ্রামটা বুক পকেটে রেখে সর্দার প্যাটেল শুরু করলেন, 'অ্যাজ আই ওয়াজ আর্গুইং মিলর্ড ! দ্যা অ্যাকিউজড ডিড নেভার....আই রীপিট, নেভার...'

পাক্কা পঁয়তাল্লিশ মিনিট সওয়াল চালিয়ে গেলেন তিনি।

আদালতের নথী থেকে তথ্যটা সংগ্রহ করেছেন সর্দার প্যাটেলের জীবনীকার। টেলিগ্রামটা এসেছিল দেশ থেকে—সর্দার প্যাটেলের দীর্ঘদিনের জীবনসঙ্গিনীর মৃত্যুসংবাদ !

মিসেস্ জৈন এলেন ঘরে। ওঁর পিছন পিছন একটা ট্রলি ঠেলে নিয়ে এক অবগুণ্ঠনবতী। বৃদ্ধ-বৃদ্ধার খিদমদ্‌গারনি। চাকা দেওয়া ট্রলি থেকে খাবারের প্লেট নিয়ে দাদীমা নামিয়ে দিলেন টিপয়ে। বললেন, 'পহিলে থোড়া খা লে। এ বুড্ডা বক্‌বক্ শুরু করনেসে....'

বৃদ্ধ এক টিপ নস্য নিলেন শুধু।

আহারান্তে ঘর নির্জন হলে বৃদ্ধ হিন্দিতে বললেন, 'প্রতিবেশীর ব্যাপারে অহেতুক নাক গলানোও যেমন অশোভন তেমনি প্রতিবেশীর বিপদে উদাসীন থাকাও অন্যায়। আমাকে সচ্‌মুচ বল তো বেটা : রানী বেটির বিমারিটা কী ? গাইনকলজিকাল কেস না সাইকলজিক্যাল ?'

মুরলী আকাশ থেকে পড়ে। বলে, 'ওর যে কিছু একটা অসুখ হয়েছে এ-কথা ধরে নিলেন কেন ?'

'নাহলে রোজ দুপুরবেলা ঐ ডাক্তারসাব্ কী চিকিৎসা করতে আসে ? মহাবীরদাসের মা বলল, গাড়িটার গায়ে রেড-ক্রস চিহ্ন আঁকা আছে, 'ডক্টর' লেখা আছে। আগে দেখতাম, ডাক্তারবাবু দুপুর বেলা একাই আসত, নিজেই। ইদানীং দেখছি, সে এসে রানী-বেটিকে উঠিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। মহাবীরদাসের-মা বললে, 'রে' দিতে নিয়ে যায়। রানী বেটি নাকি তাই বলেছে। কিসের 'রে' ? আলট্রাভায়োলেট্ ? না, ইনফ্রা-রেড ? কেন ? 'রে' দিতে হচ্ছে কেন ? বেমারিটা কী ?'

'মহাবীর' এখানে রামদাস বজরঙবলী নন, চতুর্বিংশতি তীর্থঙ্কর বর্ধমান মহাবীর। একমাত্র পুত্রের নাম তাই মহাবীরদাস। কিন্তু এ-কথার কী জবাব দেবে মুরলীধর ?

তাকে রক্ষা করলেন দাদীমা। বললেন, 'তোমাকে তো বলেছি, গাইনকলজিকাল ট্রাব্‌ল্‌। তা থেকে সাইকলজিকাল কমপ্লিকেশন! আমাদের জমানায় সাদির পর বহুরানীদের দেড়-দু-বছর অন্তর বাচ্চা হত—ছেলেমেয়ে মানুষ করতে করতেই জিন্দেগী কেটে যেত। ডানে-বাঁয়ে তাকাবার ফুরসৎ আমরা পাইনি। অসুখ-বিসুখ ধারে কাছে ভিড়তে সাহস পেত না। এখন নয়া-জমানা! একটা বাচ্চা হল, তো পাঁচ-সাত বছর ট্যাবলেট খেয়ে চল! কমপ্লিকেশন তো হবেই। রানীর আর একটা বাচ্চা না হলে এ বেমারি তার সারবে না, এই আমি তোকে সাফ বাৎ বলে দিলাম মুরলী!'

বৃদ্ধ ঘাড় নেড়ে সায় দিলেন, 'সহি বাৎ! লেকিন ডাক্তারবাবুও কি তাই বলছেন?'

'হ্যাঁ, তাই বলছেন। তুমি আর গল্পগাছা কর না, মুরলী-বেটা। তোমার দেরী হয়ে যাবে। ও বাড়িতে রানী ফিরে এসেছে। মুন্নাও স্কুল থেকে ফিরে এসেছে। আমি ওদের গলা শুনতে পেয়েছি। অব্‌—যাও....।'

বৃদ্ধা সায় দিলেন, 'হাঁ, হাঁ, যাও! এতক্ষণে নিশ্চিন্ত হলাম।'

বৃদ্ধা ওর বাহুমূল ধরে পাশের ঘরে নিয়ে এলেন। এদিক ওদিক দেখে নিয়ে বললেন, 'তুই কিছুই জানতিস না, না রে?'

মুরলী নিঃশব্দে দু-দিকে নেতিবাচক মাথা হেলালো।

'রানীর ব্যবহারে ইদানীং কিছু পরিবর্তনও লক্ষ্য করিসনি?'

মুরলীধর সে প্রশ্নের জবাব না দিয়ে প্রতিপ্রশ্ন করল, 'গাড়িতে রেড-ক্রস চিহ্ন আছে? ডাক্তারের গাড়ি?'

'আরে না! ও—তো বুড়াকে বোঝানোর জন্য গপ্‌ ফেঁদেছি আমি। ডগ্‌ডার থোড়াই আছে!'

'লোকটাকে তুমি দেখেছ, দাদীমা? দেখলে চিনতে পারবে?'

বৃদ্ধা বললেন, 'পারব। শুধু তাই নয়, ওর নাম, ঠিকানা, টেলিফোন নম্বর সবই তোকে ইচ্ছে করলে জানাতে পারি। মায় ফটোও!'

মুরলী বাধা দিয়ে বলে, 'কেমন করে? তুমি জান লোকটা কে? কোথায় থাকে?'

'না, জানি না। কিন্তু ওর গাড়ির কী মেক, কী নম্বর, তা আমি জানি। সেই সূত্রে মটোর-ভেহিক্লস্‌ থেকে গাড়ির মালিকের নাম পাওয়া যাবে। মহাবীরের মুভি ক্যামেরাতে টেলিফটো-লেন্স অ্যাটাচ্‌মেন্টও আছে। আমার কাছেই আছে।

আমার পুবের ঘরের জানলা থেকে আমি দিনের পর দিন ওদের যাওয়া আর আসার ক্লোজ-আপ ফিল্‌ম্‌ তোকে তুলে দিতে পারি।' কিন্তু ও পথে তুই চিন্তা করিস্‌ না, বেটা। ওটা সমাধান নয়!'

'কোন্‌টা সমাধান নয়?'

'তুই যা ভাবছিস্‌। ডিভোর্স!'

'কেন নয়? ঐ দ্বিচারিণী স্ত্রী....'

'খামোশ!'—ওকে মাঝপথে থামিয়ে দিলেন বৃদ্ধা। বললেন, 'সাত-সাতটা বছর রানী-বেটি তো এমন ছিল না! নিজের বুকে হাত দিয়ে একবার দেখ, বেটা, তুই নিজেই কী ওকে ও পথে ঠেলে দিসনি? টাকা-টাকা-টাকা! আমি এই একাত্তর বছরের জীবনে কত কেস যে দেখলাম তার ইয়ত্তা নেই। সবই আমার জান-পহ্‌চান, নিকট আত্মীয়, রিস্তেদার! সতী-লক্ষী বউকে ঘরে নিয়ে এল, হনিমুনে গেল, এক-বছর-দেড়বছর মাথায় তুলে ধেই-ধেই নাচল! ব্যস্‌! খেল্‌ খতম্‌! ইর্‌রিপেয়ারেব্‌ল্‌ জগদ্দল মেশিনারির মতো ডাম্প করে দিল গুদামে।....না, না, বাধা দিস্‌ না.... আমাকে বলতে দে! তুই বলবি, ওর জন্যে টি. ভি. কিনে দিয়েছিস, ভি. সি. আর. কিনে দিয়েছিস, ক্যাসেট প্লেয়ার আর কী কী সব হাবিজাবি কিনে দিয়েছিস! কিন্তু তাতে কি একটা বহুরানীর মন ভরে রে? সকাল থেকে সন্ধ্যা টাকা-টাকা-টাকা মন্ত্রজপ করে সাতরাজ্য পাক মেরে যখন রাত দশটায় ঘরে ফিরে আসিস্‌ তখন কি কোন দিন নজর তুলে দেখেছিস, ও কী রঙের শাড়ি পরেছে? ও মাথায় ফুল দিয়েছে, কি দেয়নি? আমাদের আমলে আমরা হাতে-পায়ে মেহেন্দি দিতাম—এখন তা আউট-অব-ফ্যাশান—কিন্তু মেয়েরা লিপ্‌স্টিক তো আজও ব্যবহার করে, নেল পালিশ তো এখনো ব্যবহার করে। কোন দিন বাড়ি ফিরে কি তোর মনে হয়েছ—রানী আজ মাথায় শ্যাম্পু করেছে? তাই আজ ওর চুলগুলো রেশমের মত নরম?'

মুরলী মণিবন্ধের দিকে তাকিয়ে দেখল। বলল, 'চলি, দাদীমা। আমার দেরী হয়ে যাচ্ছে।'

মিসেস জৈন হাসলেন। সংসারঅভিজ্ঞার প্রশান্ত নির্লিপ্ত হাসি। ঝক্‌ঝকে বাঁধানো দাঁতে নিয়ন আলো প্রতিফলিত হল। বললেন, 'না রে বেটা। তোর দেরী হয়ে যায়নি। তোর ইন্টারভিয়ু সন্ধ্যা ছয়টায়, তাজ-বেঙ্গলে। তার অনেক দেরী। আসলে আমার কথাগুলো তোর মনপসন্দ্‌ হচ্ছে না।'

মুরলী চলতে শুরু করেছিল। হঠাৎ থম্‌কে থেমে পড়ে। ঘুরে দাঁড়িয়ে বলে,

'তুমি কেমন করে জানলে দাদীমা, যে, আমার ইন্টারভিয়ু তাজ-বেঙ্গলে ? সন্ধ্যা ছয়টায় ?'

'তোর বউয়ের কাছে শুনেছি। ও যে অনেক-অনেক আশা করে বসে আছে। ওর বরের স্যালারি ডবল হয়ে যাবে! পার্কস্ বেড়ে যাবে!....'

'ঠিক আছে। চলি আমি।'

'বাড়িতে যাস্-নে। রানীর সঙ্গে অহেতুক ঝগড়া হয়ে যাবে। ইন্টারভিয়ুটা খারাপ হয়ে যাবে। দিমাগ্ ঠিক না থাকলে....'

'আই নো, আই নো....'

গট্‌গট্ করে লিফ্‌ট-এর দিকে এগিয়ে গেল এম. ডি.।

॥ সাত ॥

ক্লান্ত অপরাহ্ণে এম. ডি. এসে পৌঁছল হোটেল তাজ-বেঙ্গল-এ। রাস্তায় জ্যাম পায়নি। ফাইভ-স্টার হোটেলের 'কার-প্লেসে' গাড়িটা পার্ক করে নেমে এল। লক্ করে এগিয়ে এল রিসেপ্শান-কাউন্টারের কাছে। হাতঘড়ির সঙ্গে হোটেলের ঘড়িটা মিলিয়ে দেখল। দুটো ঘড়িতেই চারটে বেজে বত্রিশ। অনেকটা সময় আছে। ইচ্ছে করলে, তাজ-বেঙ্গলের রেস্তোরাঁয় গিয়ে বসা যায়। কিন্তু দাদীমার গাজরের হালুয়ার স্বাদ এখনো মুখে লেগে আছে। পায়ে পায়ে মুরলীধর লনের ধারে গিয়ে একটা কুঞ্জবীথির একান্তে বেঞ্চিতে বসল। কৃত্রিম আলোকে বেঞ্চিটা আলো-আঁধারী। বলা যায় : 'ল্যভ্স-কর্নার'। এখানে কেউ তাকে লক্ষ্য করবে না।

গাড়ি ড্রাইভ করে আসার পথেই সে পরবর্তী পদক্ষেপগুলোর কথা মোটামুটি ধারাবাহিক ভাবে চিন্তা করে রেখেছে। এখন এখানে শান্ত চিত্তে কার্যক্রমের ছকটা মস্তিষ্কে গেঁথে ফেলতে হবে। মূল লক্ষ্য : রানীমেধযজ্ঞ এবং নূতন জীবনের পত্তন। বিবাহবন্ধনের মূর্খামিতে আর নয়। স্রেফ ফুলে-ফুলে মধুকরবৃত্তি!

ইন্টারভিয়ু দিয়ে ফিরে বাড়ি গিয়ে রানীর সঙ্গে কোন বিতর্কে জড়িয়ে পড়বে না। ভালই হোক আর মন্দই হোক—ইন্টারভিয়ু কেমন হয়েছে সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনাও করবে না। অ্যাশ্ট্রের প্রসঙ্গ উঠলে হেসে উড়িয়ে দেবে। বলবে, তুমি নিজেই সিগ্রেট ধরেছ নাকি? ওকে কোনক্রমেই বুঝতে দেবে না যে, ওর ঐ মধ্যাহ্ন-অভিসার বিষয়ে মুরলীধরের মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ জেগেছে। ওদের দ্বিপ্রাহরিক অবৈধ প্রেমের খেলা যেমন চলছে চলুক! এদিকে সপ্তাহখানেকের ভিতর ধীরে ধীরে যাবতীয় ব্যাঙ্কের জয়েন্ট-অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা তুলে ওর একক-অ্যাকাউন্ট যে-কটা আছে তাতে ট্রান্সফার করে নিতে হবে। ঐ সঙ্গে

প্যাটেল-দম্পতির যাবতীয় জয়েন্ট-ভল্ট থেকে নগদ টাকাও সরিয়ে ফেলতে হবে। হেতু সহজবোধ্য : 'শো-ডাউন' শুর হলে—ডিভোর্সের মামলা দায়ের হলে, শ্রীমতী রাধাকে পিতৃগৃহে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। সেখান থেকে তাকে মামলা লড়তে হবে কর্নেল সিন্‌হার অর্থানুকূল্যে।

ঐ আর একটি লোক : কর্নেল নীরদবরণ সিন্‌হা—ওর শ্বশুর মহাশয়। অতি ঘড়েল ব্যক্তি। জামাতা বাবাজীবনকে তিনি পাত্র হিসাবে অনুমোদন করেননি। হেতু ? তাঁর মতে মুরলীধর 'অসৎ'। খোদায়-মালুম—কোন্ সূত্রে এ সংবাদ সংগ্রহ করেছিলেন তিনি, কিন্তু ওদের কোর্টশিপের প্রথম দিকে তাঁর প্রবল আপত্তি ছিল। এবং তাঁর সতর্কপ্রহরা এড়িয়ে তাঁর কন্যাকে ইলোপ করায়, মা-মেয়ের চাপে তিনি সামাজিক বিবাহ অনুমোদন করলেন বটে কিন্তু প্রত্যাশিত যৌতুকাদি দিলেন না। মুরলীধর অবশ্য তাতে ভ্রূক্ষেপ করেনি।

বিবাহিত জীবনে সে বহুবার শ্বশুরবাড়ি গেছে, সামাজিক নিমন্ত্রণ রাখতে, সৌজন্য সাক্ষাতেও। শাশুড়ী আদরযত্নের ত্রুটি রাখেননি, কিন্তু কর্নেল-সাহেবের ভাবখানা ছিল, 'না—আবাহন, না—বিসর্জন !' বছরখানেক আগে তিনি নিজে থেকে ওদের দুজনকে একবার ডেকে পাঠিয়েছিলেন। আদরযত্নের পর মুরলীধরকে জনান্তিকে নির্জন ঘরে ডেকে এনে বলেছিলেন, 'বাবাজি, এবার তোমাকে ডেকে পাঠানোর একটা বিশেষ তাৎপর্য আছে। আমার তো বয়স হয়ে যাচ্ছে, তাই একটি উইল করেছি। তোমাকে সে উইলে সাক্ষী রাখতে চাই।'

মুরলীধর চমকে উঠে বলেছিল, 'আপনার 'লাস্ট টেস্টামেন্টে' আমি কেমন করে সই দেব ? আপনি জানেন না যে, উইলের যারা বেনিফিশিয়ারি তারা বা তাদের 'স্পাউস' উইলে'র সাক্ষী হতে পারে না ?'

কর্নেল সিন্‌হা হাসিমুখে বলেছিলেন, 'এটুকু রুডিমেন্টারি আইনজ্ঞান আমার আছে, বাবাজীবন। তুমি কি স্বাক্ষর করতে স্বীকৃত ?'

মুরলীধরও হাসিহাসি মুখে বলেছিল : ও শ্যিওর ! আপনি যখন চাইছেন....'

উইলে তিনি কাকে কী দিয়েছেন মুরলী জানে না। তাঁর একমাত্র মেয়ে-জামাই যে বঞ্চিত এটুকুই শুধু জানে। জামাতার সম্মুখেই কর্নেল-সাহেব টেস্টামেন্টের শেষ পৃষ্ঠায় স্বাক্ষর করলেন এবং মুরলী তার নিচে সাক্ষী হিসাবে সই দিয়ে উইলটাকে পাকা করে দিয়েছে।

ওর তীব্র ইচ্ছা রানীর সঙ্গে বিবাহ-বিচ্ছেদ সম্পন্ন হবার পর শ্বশুর-মশাইকে বলা, আপনি যদি নতুন করে উইল করেন তাহলে আমাকে আবার ডেকে পাঠাবেন, স্যার। আবার নতুন করে সাক্ষী হিসাবে সই দিয়ে আসব !

তৃতীয়ত, নিউ আলিপুরের 'সুকৌশলী' নামে একটা প্রাইভেট ডিটেকটিভ এজেন্সিকে এ-কাজে নিয়োগ করা। রানী যদি সাবধান না হয়, যদি ঘুণাক্ষরেও টের না পায় যে, সে সন্দেহ করেছে, তাহলে সাত দিনের মধ্যে ঐ প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটিং এজেন্সি যাবতীয় এভিডেন্স আর একরাশ ফটো ওকে এনে দিতে পারবে। স্ত্রী ব্যভিচারিণী—এটা আদালতে প্রমাণ করা কঠিন হবে না আদৌ।

সমস্যা সেটা নয়। সমস্যা : মামণি। সেটা অবশ্য সমস্যা হিসাবে দেখা নাও দিতে পারে। ঐ অজানা লোকটা রানীকে নিয়ে শুধু খেলা করতেই এসেছে কি না জানা নেই। হয়তো ডিভোর্সের পর সে কেটে পড়বে। আর যদি সে রানীকে বিবাহ করতে চায় তাহলে 'মামণি' তার কাছে অহৈতুকী বাধা হিসাবে দেখা দেবে। মুশকিল হবে লোকটা যদি কেটে পড়ে। তখন হয়তো রানী তার মাতৃত্বের অধিকার আদালতে পেশ করবে। সচরাচর বিচারক মায়ের দাবিটাই এসব ক্ষেত্রে মেনে নেন। মুরলীধর আপত্তি তুলবে—রানীর উপার্জন নেই, আর্থিক কারণে সে মেয়েকে মানুষ করে তুলতে পারবে না। কর্নেল-সাহেবের ভিক্ষার দানটা অনিশ্চিত। অপরপক্ষে মুরলীধর ম্যাজিস্ট্রেটকে বলবে, সে মেয়ের নামে কয়েক লক্ষ টাকার একটা এন্ডাওমেন্ট করে দিতে প্রস্তুত, যে টাকার সুদে ও কনভেন্টে থেকে পড়াশুনা করবে। সন্তানের বাবা অথবা মা ইচ্ছা মতো গিয়ে হস্টেলে মেয়ের সঙ্গে দেখা করে আসতে পারবেন। এতে কোনও বিচক্ষণ ম্যাজিস্ট্রেট কোনক্রমেই আপত্তি করতে পারেন না। সুতরাং রানীর কাছ থেকে মামণিকে মানসিক ভাবে কেড়ে নেওয়াটাও কঠিন হবে না।

ফাইনাল স্টেপ : 'সুকৌশলী'কে দেওয়া হবে আরও একটা কঠিন কাজের দায়িত্ব। মুরলীধর মোটা অঙ্কের পারিশ্রমিক দিতে প্রস্তুত। যদি 'সুকৌশলী' কোনক্রমে খুঁজে বার করতে পারে সেই দুর্বিনীত মহিলাটিকে। দীর্ঘাঙ্গিনী। সাধারণ বাঙালী মেয়ের তুলনায়। অ্যারাউন্ড একশ পঞ্চাশ সে. মি.। ওজন : ষাট কেজির কাছাকাছি। রঙ : ফর্সা। চোখের মণি সুগভীর কালো, আর তাতে যেন একটা অতলান্ত গভীরতা। ভাইটাল স্ট্যাটিস্টিক্স—ঐ বয়সী মেয়ের পক্ষে প্রায় অবিশ্বাস্য। যাকে বলে : 'মধ্যক্ষামা'। নাম : অসীমা। উপাধি : জানা নেই। প্রাকবিবাহ জীবনে ছিল : সেন। গ্র্যাজুয়েট। বয়স ত্রিশ থেকে তেত্রিশ। নিরাভরণ, গরিব। একটি মাত্র সন্তানের জননী। পুত্র সন্তান : বাবলু। স্বামী বিকৃতমস্তিষ্ক। পাগল হয়ে যাবার আগে ছিল কোন একটি ট্রেড ইউনিয়ানের পাণ্ডা। কোন্ রাজনৈতিক দল ? জানা নেই। কী বললেন ? ইন্‌সাফিশিয়েন্ট ডাটা ? এটুকু তথ্য থেকে শ্রীরামপুরের মতো শহরে একটি মেয়েকে খুঁজে পাওয়া যাবে না ?

হোক সে সুন্দরী ? হোক তার চোখ অতলান্ত গভীর, আর দেহাকৃতি ডম্বরু মানের ? তবে শুনুন, মশাই : ফ্যাক্‌টারিতে চলেছিল—শুম্ভ-নিশুম্ভের যুদ্ধ—স্ট্রাইক আর লকআউট। শেষমেশ ধর্মঘট যখন মিটে গেল তখন কোম্পানি লক্‌-স্টক-ব্যারেলকে্ চাকরিতে ফিরিয়ে নিয়েছিল। দুটি মাত্র অনারেব্‌ল্‌ এক্‌সেপ্‌শান বাদে। একজন ঐ সুন্দরী মেয়েটির স্বামী, যেহেতু সে পাগল হয়ে গেছে ; দ্বিতীয়জন আত্মহত্যা করায়। এটাই ভাইটাল ক্লু ; কারণ ঐ দ্বিতীয়জনের নাম পুলিশ-রেকর্ডে নিশ্চয় পাওয়া যাবে। নাম : সুবল।

ঐ পলাতক গরবিনীকে চাই এম. ডি. প্যাটেল, এম. ডি.-র। কারণ, ঐ মেয়েটি তার জীবনের প্রথম প্রেম !

না ! সেজন্যে নয়। ঐ মেয়েটিকে চাই অন্য কারণে : অসীম অর্থনৈতিক শক্তিশালী ম্যানেজিং ডিরেক্টারের নাকে ঝামা ঘষে দিয়ে, চুনিবসানো সোনার আংটিটা হেলায় ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে, সেই মেয়েটি তেজ দেখিয়ে বেরিয়ে গেছে। ওকে অপমান করার দুঃসাহস দেখিয়েছে।

কলেজ জীবনে ঐ মেয়েটি তার প্রেমে পাগল হয়েছিল—এই ত্রিশ বছর বয়সেও মেয়েটি স্বীকার করেছে কথাটা—তবু সুদর্শন এম. ডি.-র সঙ্গে সেই গরবিনী কোন দিন একশয্যায় শুতে রাজি হয়নি !

অর্থের ক্রয়ক্ষমতা সম্বন্ধে একটা বাস্তব পরীক্ষা করতে চায় অর্থনীতির সেরা ছাত্রটি। ঐ মেয়েটিকে খুঁজে পেলে সে আর একটা 'অফার' দিতে চায়। ওর পাগল স্বামীকে ভর্তি করে দেওয়া হবে একটা ভাল মেন্টাল হসপিটালে, তিন-শিফ্‌টে তার নার্সিং-এর ব্যবস্থা থাকবে। ওর আনপড় ছেলেটিকে ভর্তি করে দেওয়া হবে কোনও বোর্ডিং-ওয়ালা কনভেন্ট স্কুলে—প্রয়োজনে লাখটাকা ডোনেশান দিয়ে।

ও পরীক্ষা করে দেখতে চায় ঐ তথ্যটা সত্য কি না : 'রেডি মানি ইজ আল দীন্‌স ল্যাম্প।'—টাকার জোরে সবকিছু সম্ভব !

এম. ডি.-র তরফে শর্ত একটাই : নগ্ন নতজানু অবস্থায় প্রার্থীকে দানটা গ্রহণ করতে হবে। তারপর একরাত কাটাতে হবে তার বিছানায়।

কোথাও ঢং করে ঘড়িতে আধঘণ্টার সময়-সঙ্কেত হল। এম. ডি. চমকে নিজের মণিবন্ধের দিকে তাকিয়ে দেখে। আশ্চর্য ! পুরো এক ঘণ্টা কেটে গেছে ! ও টেরও পায়নি !

বাগান ছেড়ে ও উঠে এল রিসেপ্‌শানে। ওর ইন্টারভিয়ু সুইট নম্বর 5/20-তে। অর্থাৎ পাঁচতলার বিশ নম্বর ঘরে। রিসেপ্‌শানে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বসে আছেন জনা-দশেক সুবেশ ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা। একখানা ম্যাগাজিন তুলে নিয়ে সে একপ্রান্তে এসে বসল। হঠাৎ নজর হল বিপরীত প্রান্তে একটি বড় 'সেটী'র একপ্রান্তে বসে আছে একটি অত্যন্ত সুন্দরী তরুণী। প্রথম-নজরে ওর মনে হয়েছিল বিখ্যাত সিনেমা-স্টার মুনমুন সেন। পরক্ষণেই বুঝতে পারে নিজের ভুলটা—না, ঐ রকম দেখতে বটে, তবে এ অন্য একটি মেয়ে। আশ্চর্য! মেয়েটি ওর দিকেই তাকিয়ে আছে। চোখাচোখি হতেই দৃষ্টি নামিয়ে একটা সংবাদপত্রে নিবদ্ধদৃষ্টি হল। কলেজে এককালে প্যাটেলের নাম ছিল 'লেডি-কীলার'। সহপাঠীরাই বদনামটা দিয়েছিল। একাধিক মেয়ে ওর দিকে ঝুঁকেছিল। মীরা, জয়তী আর অসীমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল—কিন্তু এ-ছাড়া আরও অনেকের চোখের মুগ্ধ দৃষ্টি তার নজর এড়ায়নি। এখন অবশ্য সে ত্রিশের ওপারে, এক সন্তানের জনক, তবু আত্মবিশ্বাসটা তার একেবারে নিঃশেষ হয়ে যায়নি! আরে! মেয়েটা আবার চোখ তুলে ওর দিকেই তাকাল।

প্যাটেল উঠে পড়ে। ম্যাগাজিনটা হাতে নিয়ে গুটিগুটি এগিয়ে যায় মেয়েটির দিকে। মেয়েটি যে ওর ঘনিয়ে আসা সম্বন্ধে সবিশেষ সচেতন তা বেশ বোঝা যায়, তার চোখ খবরের কাগজে সেঁটে থাকায়। প্রায় হাত-খানেক দূরত্বে আসার পর প্যাটেল অনুচ্চকণ্ঠে বলে, 'শুভ সন্ধ্যা! আমি এপাশে একটু বসতে পারি? অসুবিধা হবে না তো?'

মেয়েটি চমকিত হবার অভিনয় করে। উদ্দেশ্যমূলকভাবে চারপাশে তাকিয়ে দেখে—কাছাকাছি সব আসনই ফাঁকা। চোখে চোখে না তাকিয়ে পুনরায় খবরের কাগজের দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে বলে, 'না, অসুবিধা কেন হবে? বসুন।'

প্যাটেল বসল ওর পাশে। দু-আঙুল দূরত্ব রক্ষা করে। সযত্নে। যাতে গায়ে গা না লাগে। তারপর বলল, 'দূর থেকে আপনাকে ভীষণ চেনা-চেনা লাগছিল, কাছে এসে বুঝলাম, না! আপনি আমার সেই পরিচিতা মহিলাটি নন।'

মেয়েটি এবার চোখ তুলে তাকাল। মিষ্টি হেসে বললে, 'এমন ভুল সকলেরই হয়, এতে লজ্জা পাবার কিছু নেই। আবার অনেকে এই কথা বলে অপরিচিতা মহিলার সঙ্গে আলাপ জমাবার চেষ্টা করে। তাও ঘটে।'

প্যাটেল হেসে ওঠে। বলে, 'রিয়ালি? আপনার এমন অভিজ্ঞতা হয়েছে?'

'বহুবার! ইন ফ্যাক্ট, সব সুদর্শনারই তাই হয়।'

'বাঃ ! আপনি তো নিজের সম্বন্ধে বেশ সচেতন।'

'শুধু নিজের সম্বন্ধে কেন ? অপরের সম্বন্ধেও আমার সচেতনতায় খামতি নেই, মিস্টার প্যাটেল।'

রীতিমত চম্‌কে ওঠে মুরলীধর ! এও দেখা যাচ্ছে আর এক সতীশ জানা। কোন সূত্রে আগারওয়াল ইন্ডাস্‌ট্রিজের ম্যানেজিং ডাইরেক্টারকে চেনে। তা তো হতেই পারে। দু-একবার ছোট-ছোট ছেলেমেয়ের স্কুলে প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশানে ওকে যেতে হয়েছে। বললে, 'আই সী ! আপনি আমাকে চেনেন দেখছি।'

'আজ্ঞে না। সেটা আপনার ভুল ধারণা। বিশ্বাস করুন, জীবনে আপনাকে আজই প্রথম দেখছি।'

'তাহলে আমার নামটা জানলেন কেমন করে ?'

'সহজেই। যেহেতু আমি একজন প্রফেশনাল সুদ্‌সেয়ার—ভবিষ্যদ্রষ্টা !'

'কেন গুল মারছেন ? নিতান্ত ঘটনাচক্রে আপনি আমার নামটা জেনে ফেলেছেন। আর সেই সুবাদে অহেতুক আমার লেগপুলিং করছেন।'

'আপনার তাই ধারণা ? নিতান্ত ঘটনাচক্রেই আমি জানি যে, আপনি একটি কোম্পানির ম্যানেজিং ডাইরেক্টার ?'

মনে মনে বিস্মিত হলেও মুরলীধর মুখে বলে, 'না হবে কেন ? হয়তো তাই। হয়তো ঘটনাচক্রে কোন সেমিনারে আমাকে বক্তৃতা করতে শুনেছেন।'

'এবং নিতান্ত ঘটনাচক্রেই আমি জানি যে, আপনি বিবাহিত, এক সন্তানের জনক ; এমনকি আপনার জন্মতারিখ সতেরই সেপ্টেম্বর উনিশ শ আটান্ন ?'

প্যাটেল স্তব্ধ বিস্ময়ে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ায়।

মেয়েটিও উঠে দাঁড়ায়, বলে, 'প্লিজ ফলো মি।'

মন্ত্রমুগ্ধ প্যাটেল হঠাৎ সম্বিত ফিরে পায়। বলে, 'বাট আই কান্ট। আমার এখনি একটা....'

'আই নো। আমরা 5/20 ঘরের দিকেই যাচ্ছি, মিস্টার প্যাটেল !'

মন্ত্রমুগ্ধের মতো এম. ডি. প্যাটেল ঐ রহস্যাবৃতা সুন্দরীর পিছু পিছু এগিয়ে গেল লিফটের দিকে।

॥ আট ॥

5/20 একটা সুইট। সামনে-পিছনে দুখানি ঘর একই যুনিটে। সামনেরটা যেন ড্রইংরুম—পিছনে বেডরুম। মেয়েটি ওকে সেই 5/20 সুইটেই নিয়ে এল। নিজে বসল টেবিলের ওদিকে দরজার দিকে মুখ করে। ওকে বলল, 'বসুন।'

প্যাটেল ওর মুখোমুখি বসল ভিজিটার্স চেয়ারে।

মেয়েটি টেবিল থেকে একটা ফাইল তুলে দেখাল ; 'এটা আপনার ফাইল। এবার বুঝেছেন ?'

প্যাটেল মাথাটা ঝাঁকিয়ে বলে, 'আপনি আমাকে প্রায় পাগল করে ছেড়েছিলেন। আমি কেমন করে আন্দাজ করব যে, আপনিই মিস্টার কানোরিয়ার প্রাইভেট সেক্রেটারি ? আমার দরখাস্তের সঙ্গে সংলগ্ন বায়োডাটা আপনি আগেই দেখে রেখেছেন ? তাই আমার জন্মতারিখটাও আপনার জানা। কিন্তু একটা কথা : আপনি আমাকে চিনলেন কী করে, মিস রাও ?'

টেবিলে একটি ছোট্ট ফলকে মেয়েটির নাম লেখা : 'মীরা রাও।'

'মিসেস্। কী আশ্চর্য! পাসপোর্ট-সাইজ ফটোও কি আপনি পাঠাননি দরখাস্তের সঙ্গে, আর আমি তো নিচে বসে আপনাকেই ধ্যান করছিলাম।'

'ধ্যান করছিলেন ?'

'প্রতীক্ষা করছিলাম, আর কি। কী খাবেন বলুন ? চা না কফি, না কি ঠাণ্ডা কিছু ? অথবা এক-এক পেগ্....

'আরে না, না, পনের মিনিটের মধ্যে আমার জীবন-মরণ সমস্যা! এখন কি কেউ ড্রিংক করে ?'

'জীবন-মরণ সমস্যা! কেন ? এই ইন্টারভিয়ুটাকে এত গুরুত্ব দিচ্ছেন কেন ?

'আপনি জানেন না, আমি যা মাইনে পাই তার....'

'আই নো, আই নো, আপনি তো আপনার দরখাস্তে প্রেজেন্ট স্যালারি উল্লেখও করেছেন।'

'তাহলে তুমি তো বুঝতেই পারছ ; আমি কী ভীষণ ঈগার !'

'সেক্ষেত্রে শুধু দু কাপ কফি অর্ডার করি ?'

'না ! বরং তুমি বল, রাত্রে আমার সঙ্গে ডিনার করবে ?'

'ডিপেন্ডস্ ! তোমার ইন্টারভিয়ুটা ভালয়-ভালয় মিটুক !'

প্যাটেল ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখে। এখনো পনের মিনিট বাকি। জানতে চায়, 'ইন্টারভিয়ু বোর্ডে কে কে থাকবেন, মীরা ? তুমি জান ?'

'কেন জানব না ? মিস্টার-অ্যান্ড মিসেস্ কানোরিয়া। আর হয়তো মস্যুয়ে নোনাগাকি। মানে, যদি তিনি ইতিমধ্যেই টোকিও চলে না গিয়ে থাকেন—'

'আই সী ! আর ক্যান্ডিডেট ক'জন ?'

'তাও জান না ? তুমি একলাই। মিনিমাম কোয়ালিফিকেশন এতই উচ্চমানের যে, দ্বিতীয় কোন আবেদনকারী নেই। তুমি ধরে নিতে পার, তোমার চাকরিটা হয়েই গেছে—যদি না....'

'যদি না—'

'আই মীন, যদি না তুমি কোনও রুডিমেন্টারি ব্লান্ডার করে বস। সে-ক্ষেত্রে আবার আমাদের অ্যাডভার্টাইজ করতে হবে। তাতে অনেক খরচ, অনেক বখেড়া। কারণ মিস্টার অ্যান্ড মিসেস কানোরিয়া কালই জাকার্তা চলে যাচ্ছেন। ফলে পোস্টটা মাসতিনেকের আগে ফিল আপ করা যাবে না !'

ঠিক তখনই বাইরের দিকের দরজাটা খুলে গেল। বছর চল্লিশের এক ভদ্রলোক প্রবেশ করলেন। মীরা আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। ভদ্রলোক জানতে চাইলেন, 'মিসেস কানোরিয়া এসেছেন ?'

'নো স্যার !'

ভদ্রলোক নিজ মণিবন্ধের দিকে তাকালেন। প্রয়োজন ছিল না। ঘরের ঘড়িটা নিখুঁত সময় দিয়ে চলেছে—পাঁচটা সাতচল্লিশ। উনি দ্বিতীয় বাক্য উচ্চারণ না করে নরম গালিচা মাড়িয়ে ভিতরের ঘরে চলে গেলেন। স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রে দরজাটা আপনিই বন্ধ হয়ে গেল। মীরা প্যাটেলের দিকে ফিরে বললে, 'উনিই হচ্ছেন মিস্টার কানোরিয়া।'

'সেটা বলা বাহুল্য।'

ঠিক তখনই টেবিলের উপর টেলিফোনটা বেজে উঠল। মীরা সেটা তুলে নিয়ে আত্মঘোষণা করল। ও-প্রান্ত থেকে কে, কী জানতে চাইছেন শুনতে পেল না প্যাটেল, তবে উত্তরগুলো শুনে আন্দাজ করল ঠিকই।

'গুড ঈভনিং ম্যাডাম—আজ্ঞে হ্যাঁ, এসেছেন। এই আমার সামনেই বসে আছেন.....ইয়েস, ইয়েস। তিনিও এসেছেন এইমাত্র।....কী ? হ্যাঁ তিনি ভিতরে গিয়ে বসেছেন....ইয়েস ম্যাডাম, দিচ্ছি।'

কলটা সে ভিতরের ঘরে পাচার করে নিজের যন্ত্রটা ধারক অঙ্গে নামিয়ে রেখে প্যাটেলকে বললে, 'ম্যাডাম কানোরিয়া। ট্রাফিক জ্যামে আটকে পড়েছেন। অনেক দিন কলকাতার বাইরে তো ! উনি জানেনই না কী হরিব্‌ল্ ট্র্যাফিক জ্যাম হয় এই কল্লোলিনী কলকাতায়।'

প্যাটেল জানতে চায়, 'হোয়াট অ্যাবাউট মিস্টার নোনাগাকি ?'

'তিনি টোকিও রওনা হয়ে গেছেন। লেটেস্ট নিউজ বুলেটিন। ম্যাডাম জানালেন। ফলে ইন্টারভিয়ু বোর্ডে...'

হঠাৎ বেজে উঠল ইন্টারকামটা। তুলে নিয়ে মীরা শুনল। 'ইয়েস স্যার, অল রাইট স্যার' বলে বোতাম টিপে যন্ত্রটা বন্ধ করল। প্যাটেলকে বলল, 'মিস্টার কানোরিয়া আপনাকে ও ঘরে যেতে বলছেন। বোধহয় উনি একাই ইন্টারভিয়ু নেবেন। যান। বেস্ট অব ল্যাক !'

প্যাটেল ওর 'আপনি' সম্বোধনে আপত্তি করার সুযোগ পেল না।

ছয়টা বাইশ।

ইন্টারভিয়ু বোর্ডের দুপ্রান্তে দুজন। কানোরিয়া আর প্যাটেল।

কোম্পানির প্রোপ্রাইটার আর চাকুরিপ্রার্থী।

কানোরিয়া বললেন, 'আয়াম এক্সট্রিমলি সরি, মিস্টার প্যাটেল ; এক্ষেত্রে আপনি কী করবেন বলুন ? 'ইন্টারভিয়ু' বলতে যা বোঝায় তা প্র্যাকটিক্যালি মিটে গেছে, কিন্তু থিওরেটিক্যালি মেটেনি। আই মীন, আমার দাদাজি যে লাস্ট টেস্টামেন্ট করে যান—উইল, আর কি,—সেই উইল মোতাবেক এই কোম্পানির দুজন মালিক। ফিফটি ফিফটি শেয়ারে। আমি এবং আমার ওয়াইফ। আমিই বস্তুত পলিসি ডিকটেট করি কিন্তু আইন-মোতাবেক তাঁর একটা স্বাক্ষর প্রয়োজন হয়। আজ এই তথাকথিত ইন্টারভিয়ু-বোর্ডে আমাদের তিনজনের থাকার কথা

ছিল। মিস্টার নোনাগাকি, আমার স্ত্রী এবং আমি। তার ভিতর নোনাগাকি বিশেষ কারণে আজ ওসাকা চলে গেছেন। মিসেস কানোরিয়া.....'

প্যাটেল বাধা দিয়ে বলে, 'আমি শুনেছি তিনি ট্রাফিক জ্যামে ফেঁসে গেছেন....'

'একজ্যাক্টলি ! আমার যা জিজ্ঞাসা করার ছিল....আমার এবং নোনাগাকির—কারণ সে আমাকেই তার ভোটটা দিয়ে গেছে....ওয়েল, এখন আপনার অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার ইস্যুর আগে জাস্ট ফরম্যালিটি হিসাবে ওর স্বাক্ষরটা....'

কথাটা শেষ হল না। ইন্টারকমটা বাধা দিল। কানোরিয়া তুলে নিয়ে শুনে যন্ত্রের দিকে ফিরেই বললেন, 'থ্যাংক গড ! ইয়েস, উই আর স্টিল ওয়েটিং !'

যন্ত্রটা বন্ধ করে প্যাটেলের দিকে ফিরে কানোরিয়া বললেন, 'ঈশ্বর করুণাময় ! উনি—আই মীন, আমার বেটার-হাফ—অবশেষে এসে উপস্থিত হয়েছেন। এখনি আসছেন উনি।'

দু-চার সেকেন্ড পরেই দ্বাররক্ষক দরজাটা খুলে নেপথ্যে তাকিয়ে সেলাম বাজাল, পরমুহূর্তেই ঘরে প্রবেশ করলেন মিসেস কানোরিয়া।

'ম্যাকবেথ' নাটকের সেই বিশেষ দৃশ্যটা মনে আছে? সেই যখন ম্যাকবেথের ডাইনিং রুমে ব্যাঙ্কোর প্রেতাত্মা বিনা নিমন্ত্রণে বেমক্কা ঢুকে পড়েছিল ? আর ম্যাকবেথ দাঁড়িয়ে উঠে তোৎলাচ্ছে : 'দাউ কানস্ট সে দ্যাট আই ডিড ইট !'

প্রায় সেই ভঙ্গিতেই উঠে দাঁড়ালো এম. ডি. প্যাটেল। ব্যাঙ্কোর প্রেতাত্মা ভ্রূক্ষেপ মাত্র করল না। গটগটিয়ে এগিয়ে চলল। অধ্যাপক যে ভঙ্গিতে ক্লাসের দিকে না তাকিয়েই ডায়াসের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে বলেন, 'সিডাউন সিডাউন।'

মিসেস কানোরিয়া চাকরিপ্রার্থীর দিকে তেমনি দৃকপাত মাত্র না করে টেবিলের ওপ্রান্তে চলে এলেন। স্বামীর হাতটা তুলে নিয়ে বললেন, 'আয়াম এক্সট্রিমলি সরি, রামানুজ ! কলকাতায় যে ইদানীং এজাতীয় ট্রাফিক জ্যাম হতে পারে তা আমি আদৌ আশঙ্কা করিনি ! এনিওয়ে, ইন্টারভিয়ু নিশ্চয় এতক্ষণ শেষ হয়ে গেছে ?'

'না হয়নি, ডার্লিং। ঐ তো উনি বসে আছেন। মিস্টার প্যাটেল—'

মিসেস কানোরিয়া আসন গ্রহণ করে এতক্ষণে চাকুরিপ্রার্থীর দিকে তাকাবার অবকাশ পেলেন। বললেন, 'গুড ঈভনিং মিস্টার প্যাটেল, আয়াম সো সরি—

প্রায় বাইশ মিনিট লেট হয়েছে আমার।'

প্যাটেল কোনোক্রমে গলাটা সাফ করে বলে, 'গুড ঈভনিং, ম্যাডাম, আপনি যে জ্যামে আটকা পড়েছেন তা মিসেস রাওয়ের কাছে শুনেছি।'

'আই সী! আলাপ হয়েছে তাহলে মীরার সঙ্গে! হবেই। ও যা সুন্দরী! নজরে পড়বেই। বিশেষ আপনার মতো তীক্ষ্ণদৃষ্টি।....'

মিস্টার কানোরিয়া বলেন, 'কেন অহেতুক মিস্টার প্যাটেলের লেগ পুল করছ? যদি প্রশ্ন করার কিছু থাকে, তো কর। না হলে আমার সঙ্গে একমত হয়ে স্বাক্ষর দাও—'

মিসেস বলেন, 'লুক হিয়ার, রামানুজ! নোনাগাকি যদি আজ থাকতে পারত তাহলে আমার মতামতের একটা মূল্য থাকত। কারণ তোমরা দুজনে দুরকম সিদ্ধান্তে এলে কাস্টিং ভোটটা আমিই দিতাম। কিন্তু নোনা তোমাকেই তার ভোটাধিকারী বলে স্বীকৃতি দিয়ে গেছে। ফলে, তুমি টু-থার্ডস ভোট কন্ট্রোল করছ। আমার মতামতের কোনও মূল্যই নেই।'

কানোরিয়া প্রতিবাদ করেন, 'তা কেন? প্রসিডিংসটা তো একটা রেকর্ড। ভবিষ্যৎকাল জানতে পারবে মিস্টার প্যাটেলের নির্বাচন দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে, না সর্বসম্মতিক্রমে।'

'অল রাইট, অল রাইট! ফর্মালিটি যখন রাখতেই হবে তখন দু চারটে প্রশ্ন করি।'

মাথা নিচু করে একটুখানি কী যেন ভেবে নিল, তার পর বললে 'মিস্টার প্যাটেল্, মনে করুন, কোম্পানি আপনার জন্য একটি কন্‌ফিডেন্সিয়াল লেডি স্টেনো স্যাংশন করেছে; আপনি চাকুরিপ্রার্থিনীদের ডিকটেশান এবং টাইপিং টেস্ট করে দেখেছেন। প্রথম পাঁচজন প্রতিযোগী—যাকে বলে—'নেক অর-নট' অর্থাৎ উনিশ-বিশ। আর তার ভিতর পঞ্চম স্থানাধিকারিণী আপনার দীর্ঘ দিনের পরিচিতা। বাকি চারজন অচেনা। আপনি কাকে নিয়োগপত্র দেবেন?'

প্যাটেল গলার টাই-নটটা ধরে অহেতুক একটু টানাটানি করল। বলল, 'ডিপেন্ডস্! আই মীন, পঞ্চম স্থানাধিকারীর সঙ্গে দীর্ঘদিনের পরিচয়ে আমার যদি এই অভিজ্ঞতা হয়ে থাকে, যে সে সম্পূর্ণ আস্থাভাজন, তাহলে কম্পিটিশনে সে পঞ্চম হলেও তাকেই নির্বাচন করব, কিন্তু ঐ পঞ্চম স্থানাধিকারীর প্রতি যদি কোনো কারণে আমার দুর্বলতা থাকে তাহলে তাকে নির্বাচন করাটা হয়ে যাবে নেপটিজম। সেটা পরিহার করব আমি।'

কানোরিয়া বললেন, 'এক্সেলেন্ট !'

মিসেস কানোরিয়া বললেন, 'ধরুন, আপনি জানতে পারলেন ঐ পঞ্চম স্থানাধিকারীর কাছে চাকরিটা নিতান্ত প্রয়োজনীয়, তবু শুধু তার প্রতি আপনার কোনো কারণে দুর্বলতা আছে বলেই প্রত্যাখ্যান করবেন ?'

প্যাটেল বলে, 'সেটাই কি উচিত হবে না আমার ? যতক্ষণ না প্রথম চারজনের সংসারের কী কী অবস্থা, তারা নিতান্ত প্রয়োজনীয়তার তাগিদে এসেছে, না ফ্যাশন মিটাতে এসেছে জানতে পারছি আমি।'....

এই সময় ইন্টারকমটা বেজে উঠল। কানোরিয়া শুনে নিয়ে তাঁর ধর্মপত্নীকে বললেন, 'মীরা বলছে তুমি নাকি আজ লাঞ্চ করনি ?'

মিসেস কানোরিয়া সলজ্জে বললেন, 'হ্যাঁ, একদম সময় পাইনি। আমার এক পুরানো বন্ধুর সঙ্গে লাঞ্চ আওয়ার্সে দেখা করতে গিয়েছিলাম। দেরি হয়ে গেল।'

'তা লাঞ্চ আওয়ার্সে পুরানো বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে গেলে, সে কিছু খাওয়ালো না ?'—সহাস্যে জানতে চাইলেন কানোরিয়া।

মিসেস কানোরিয়া জবাব দেবার আগেই প্যাটেল বলে ওঠে, 'উনি হয়তো তাকে সে সুযোগটুকু না দিয়েই নিঃশব্দে পালিয়ে এসেছেন।'

কানোরিয়া বললেন, 'এনিওয়ে, মীরা কিছু খাবার আনিয়েছে, পাঠিয়ে দিতে বলি ? খেতে খেতে ইন্টারভিয়ু চলতে পারে। আশা করি মিস্টার প্যাটেলও আমাদের সঙ্গ দেবেন। আপনি 'ভেজ' নন তো ? মীরা চাইনীজ খাবার আনিয়েছে—'

প্যাটেল জবাব দেবার আগেই মিসেস কানোরিয়া ধমকে ওঠেন, 'মীরার যেমন কাণ্ড। ও তো জানেই চাইনীজ আমার ভাল লাগে না—'

কানোরিয়া প্যাটেলেব দিকে ফিরে বললেন, 'আচ্ছা, আপনিই বলুন তো, মিস্টার প্যাটেল, এর কোনও মানে হয় ? আমাদের একটি মাত্র সন্তান—বাবলু, আছে ইংলন্ডে, ইটন-এ। সে চাইনীজ খেতে ভালবাসে। সে তা পাচ্ছে না বলে অসীমাও চাইনীজ খাবে না।'

অসীমা আর প্যাটেলের দৃষ্টি বিনিময় হল। প্যাটেল বললে, 'ইটনেও 'চাইনীজ' খাবার পাওয়া যায় মিসেস কানোরিয়া : বাবলু হয়তো তা মাঝে মাঝে খায়ও।'

'য়ু থিঙ্ক সো !' মিসেস কানোরিয়া দোমনা।

সেই সময়েই হোটেল বেয়ারাকে সঙ্গে করে মীরা এল ঘরের ভিতর। তিনটি প্লেট—কাঁটা-চামচ সমেত—নামিয়ে রাখল। চাইনীজ খাবারের সুগন্ধে ঘরটা ম....ম করতে থাকে।

অসীমা কানোরিয়া তিনটি প্লেটে চাওমিন চিলি-চিকেন আর ফ্রায়েড প্রন-বল পরিবেশন করতে থাকেন। প্যাটেল বলে, 'আর—না!'

'আপনারও তো লাঞ্চ হয়নি!' বললেন মিসেস কানোরিয়া।

'কী করে জানলেন?'

'আমাকেও তো এককালে ইন্টারভিয়ু দিতে হয়েছে। জানি, টেনশনে খেতে পারা যায় না।'

প্যাটেল এতক্ষণে অনেকটা সহজ হয়েছে। সে হেসে ওঠে। তিনজনেই খেতে শুরু করেন। প্যাটেলের মনে হয়, ব্যাঙ্কোর ভূতটা আলাদীনের দৈত্যের মতো এতক্ষণে বোতলে ঢুকেছে। পোষ মেনেছে। কেন যে আজ দুপুরে অমন ভুতুড়ে কাণ্ডটা করল তা এখনো বুঝে উঠতে পারছে না।

মীরা এবং খিদমদগারেরা ঘর ছেড়ে চলে যাবার পর কানোরিয়া বলেন, 'খেতে খেতেই কাজের কথাটা সেরে ফেলা যাক, কী বলেন। প্রশ্নোত্তরের পালা চলুক!'

প্যাটেল রাজি। বলে, 'সেই ভাল। আর যদি কোনো প্রশ্ন থাকে মিসেস কানোরিয়ার, তো পেশ করতে পারেন।'

মিসেস কানোরিয়া বলেন, 'আমি নেপোলিয়ান বোনাপার্টি নই। একসঙ্গে দুটো কাজ করতে পারি না। আহারান্তে ওসব হবে। জুৎ করে খেতে দিন তো। চাইনীজ খাবার আমার খুব প্রিয়।'

প্যাটেল এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে বললে, 'আমারও তাই। প্রাক-বিবাহ জীবনে আমার গার্ল-ফ্রেন্ড-এর সঙ্গে প্রায়ই চাইনীজ খেতাম। আমার ওয়াইফ আবার চাইনীজ একেবারে পছন্দ করেন না।'

'তাই বুঝি?'

আহারান্তে প্লেটগুলি খিদ্‌মদ্‌গারেরা উঠিয়ে নিয়ে যাবার পর মিসেস কানোরিয়া বলেন, 'এবার কাজের কথা হোক! আমার নেক্সট কোশ্চেন....'

বাধা দিয়ে কানোরিয়া বলেন, 'ভরা পেটে আবার ওসব কেন? বরং কফির অর্ডার দিই?'

'দাও। ততক্ষণ আমার প্রশ্নটা পেশ করি, কী-বলেন মিস্টার প্যাটেল?'

'করুন।'

'তর্কের খাতিরে ধরা যাক, আপনি আমাদের ইন্ডিয়া-অফিসের ইনচার্জ হয়েছেন। আপনার অধীনে আমাদের একজন ম্যানেজিং ডাইরেক্টার রাখতে হয়েছে। আপনি কি তাকে বছরে কয়েক লক্ষ টাকা 'আনঅ্যাকাউন্টেড-ফর' খরচ করতে দেবেন? আই মীন, যার হিসাব সে দেবে, বিনা স্বাক্ষরে এবং বিনা ভাউচারে?'

প্যাটেল নড়েচড়ে বসল। বললে, 'সেটারও এক কথায় উত্তর : ডিপেন্ডস। মানে--কর্তার ইচ্ছেয় কর্ম। অধিকাংশ কোম্পানি আজ ঐ ভাবে চলে। তাই প্রথমেই আমি আপনাদের কাছে জেনে নেব যে, আপনারা দু-নম্বর খাতা চালু করবেন কি না। যা ইনকাম-ট্যাক্স অফিসারকে দেখানো যাবে না। আপনারা সেই মোতাবেক নির্দেশ দিলে আমাকে সেই পথেই চলতে হবে। আফটার অল—অনেস্টি ইজ এ মিয়ার ক্রীড দীজ ডেজ, নট্ দ্য বেস্ট পলিসি। তবে পলিসি নির্ধারণ করবেন আপনারা তিনজন—মিস্টার নোনাগাকি, এবং আপনারা দুজন।'

'ধরুন আমরা তিনজনেই বললাম : দু-নম্বর খাতা খোলা হবে। তাই আপনি আপনার এম. ডি.-কে কয়েক লক্ষ টাকা দিয়ে বললেন, কোম্পানির প্রয়োজনে যেখানে যা খরচপত্র করা দরকার, যাকে যেটুকু 'পান-খাওয়ানো' দরকার তা করুন। এবং আপনি ঘটনাচক্রে জানতে পারলেন সেই সুযোগে আপনার এম. ডি. ক্যাশ থেকে টাকা নিয়ে তার কলেজ-জীবনের বান্ধবীকে টাকা দিচ্ছেন—যাতে তার ওয়াইফ না জানতে পারেন যে, সেই কলেজ-জীবনের বান্ধবীর সঙ্গে ঐ এম. ডি.'র আজও যোগাযোগ আছে, তখন আপনি কী করবেন? এম. ডি.-কে স্যাক করবেন, না করবেন না?'

প্যাটেল রুমাল দিয়ে মুখটা মুছে নিয়ে বলল, 'এক্সকিউজ মি, আমি ঠিক আপনার প্রশ্নটা বুঝতে পারছি না।'

'বাট হোয়াই? আর য়ু এ ফুল অর এ নেভ?'

কানোরিয়া বাধা দিয়ে বলে ওঠেন, 'অসীমা....'

'প্লিজ স্টপ, মিস্টার পার্টনার! আপনার যা প্রশ্ন আপনি করেছেন; আপনার যা মার্কিং তা আপনি লিখেছেন। ইটস মাই টার্ন নাউ! আমার প্রশ্নের জবাবটা ওঁকে দিতে দিন। আমি আমার অভিজ্ঞতায় এমন এম. ডি.-কে জানি, যে, কোম্পানির দু-নম্বর খাতায় হিসেব লিখে নিজের ব্ল্যাকমেলিং-এর টাকা মেটায়। ওয়াইফের কাছ থেকে প্রাক-বিবাহ জীবনের বান্ধবীকে আড়ালে রাখতে খরচ

করে। আমি জানতে চাই মিস্টার প্যাটেল তাদের কী চোখে দেখেন ?'

প্যাটেল নড়েচড়ে বসে। বলে, 'এ-কথার জবাব চাওয়ার অর্থ হয় না। কোম্পানি যদি এম. ডি.-কে ঐ জাতীয় কাজ করতে দেখে তবে তাকে নিশ্চয় স্যাক করবে।'

'আর ইন্টারভিয়ু দেবার আগেই যদি তার ইন্টিগ্রিটির বিষয়ে সন্দেহ জাগে ? এবং যাচাই করে দেখা যায় যে লোকটা ডিজঅনেস্ট, অসৎ, তখন তাকে কি চাকরিতে বহাল করে ? না, করে না ?'

প্যাটেল ধৈর্যচ্যুত হয়ে পড়ে, 'আপনি কি ইন্টারভিয়ু নিচ্ছেন, না লজিকের ক্লাস নিচ্ছেন ? না কি আমাকে নিয়ে খেলা করছেন ?'

'নাউ য়ু আর টকিং, মিস্টার প্যাটেল। আই অ্যাডমিট। আমি 'খেলাই' করছি। তবে একটা কথা : 'খেলা' কিন্তু কখনো একতরফা হয় না মিস্টার প্যাটেল, মানে মর্বিড বুড়োদের তাস নিয়ে একা-একা বসে পেশেন্স-খেলা বাদে। আর খেলাই যদি হয় তবে আপনিও নিশ্চয় খেলাটা এনজয় করছেন। মীরা রাওয়ের মতো সুন্দরীর সান্নিধ্যে সন্ধ্যাটা কাটানো, দুর্দান্ত একটা চাকরি পাওয়ার স্বপ্ন দেখা....চাওমিন, চিলি-চিকেন....মায় সোনার আংটি ফেরত পাওয়া....'

প্যাটেল উঠে দাঁড়ায়। তার মুখচোখ লাল হয়ে উঠেছে।

কানোরিয়া বলে, 'এসব কী হচ্ছে ? আমি....'

বাধা দিয়ে অসীমা বলে, 'তোমাকে আমি সব কিছুই বুঝিয়ে দেব ডার্লিং ; আগে ওঁকে চলে যেতে দাও। আমাদের কোম্পানির ইন্ডিয়া ব্রাঞ্চের প্রতিনিধিকে হতে হবে শতকরা শতভাগ অনেস্ট। আমার আশঙ্কা হয়েছিল মিস্টার প্যাটেল তা নন, সেটা জানতেই সারাটা দুপুর গেছে আমার। উনি বুঝছেন—আমি কী বলতে চাইছি। অস্থিতে অস্থিতে বুঝছেন।'

প্যাটেলের দিকে ফিরে বলে, 'ইয়েস মিস্টার প্যাটেল, আপনার ইন্টারভিয়ু শেষ হয়ে গেছে। য়ু ক্যান লীভ আস এলোন নাউ ! থ্যাঙ্কস্ !'

প্যাটেল উত্তরে কী-যেন একটা কথা বলতে গেল, বলল না। ব্রিফকেসটা তুলে নিয়ে চলতে শুরু করতেই শুনল পিছন থেকে অসীমা কানোরিয়ার কণ্ঠস্বর : 'জাস্ট এ মিনিট, মিস্টার এম. ডি. প্যাটেল, এম. ডি.।'

প্যাটেল ঘুরে দাঁড়ায়। তার চোখ দুটি নিরুদ্ধ আক্রোশে জ্বলছে। বলে, 'আবার কী ?'

'ও দরজা দিয়ে যাবেন না। ওখানে মীরা রাও বসে আছে। সে বিবাহিতা।

আপনি এই পেছনের দরজাটা দিয়ে বেরিয়ে যান। দুপুরে বলছিলেন না, আমাদের কোম্পানির ব্যাকডোরের রাস্তাটা আপনি খুঁজে পাননি—সেটাই দেখিয়ে দেওয়া বাকি আছে। তাই, খেলা শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও এটুকু এক্সট্রা টাইম খেলাতে হল। প্রীতম সিং! সা'বকো লিফ্‌ট্‌-তক্‌ পৌঁছা দো।'

দরজার কাছে যে দারোয়ানটি বসেছিল সে এগিয়ে এসে বললে, 'আইয়ে সা'ব।'

মাথা নিচু করে তার পিছন-পিছন এগিয়ে গেল প্যাটেল, পিছনের দরজা পার হয়ে লিফট্‌টার দিকে। যে খাঁচাটা তাকে 'তাজ-বেঙ্গল' হোটেলের এই পাঁচতলার বাতানুকূল ভূস্বর্গ থেকে ধূলিমলিন ভূপৃষ্ঠে নামিয়ে দেবে।

॥ নয় ॥

রাত দশটা পঞ্চাশ।

রেস কোর্সের পাশে বাঘাযতীনের অশ্বারোহী মূর্তির কাছাকাছি গাড়িটাকে পার্ক করেছিল রাত আটটায়। তারপর কোথা দিয়ে তিন ঘণ্টা সময় কেটে গেছে টেরই পায়নি। স্কুল-কলেজ জীবনে ভাল ছাত্র ছিল। ধমক খেতে অভ্যস্ত নয়। শাস্তিও ভোগ করেনি সারাজীবনে। চাকরি করেছে নানান ঘাটে। কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মতপার্থক্য যে হয়নি তা নয়। তৎক্ষণাৎ পদত্যাগ করে সদর্পে চলে এসেছে। উপার্জন করেছে প্রচুর। শাদা এবং কালো। কখনো ধরা-ছোঁয়ার মধ্যে পড়েনি। তাই অপমানিত হলে কেমন লাগে জানত না।

আজই জীবনে প্রথম একটা প্রকাণ্ড থাপ্পড় খেল। প্রত্যাঘাত করতে পারল না।

তাই গড়ের মাঠে দু-তিন ঘণ্টা ঠাণ্ডা হাওয়ায় বসে থাকার পরেও সে স্বাভাবিক হতে পারেনি। কানমাথা এখনো ঝাঁ-ঝাঁ করছে। 'রানীমেধ যজ্ঞ' পরিকল্পনাটা থেকে সরে আসেনি। কিন্তু অসীমা কানোরিয়া আজ ভিন্ন গ্যালাক্সিতে! ওর নাগালের বাইরে।

একটা মটোর-সাইকল্ এসে থামল ওর ড্রাইভার-সীটের তিন হাতের মধ্যে। মুরলীধর মুখ তুলে তাকালো। পুলিস-সার্জেন্ট। বাঙালী। চোখাচোখি হতে সার্জেন্টটি প্রশ্ন করল, 'শরীরটা কি খারাপ লাগছে, স্যার?'

'না তো।'

'কারো জন্যে অপেক্ষা করছেন?'

'নাঃ!'

'তবে কি বেশি ড্রিংক করে ফেলেছেন?'

'কী আশ্চর্য! তাও নয়। সারাদিনে এক পেগও খাইনি। এসব কথা কেন বলছেন বলুন তো?'

'প্যাট্রল-ডিউটিতে আছি। ঘণ্টাতিনেক ধরে লক্ষ্য করছি, আপনি চুপচাপ এখানে গাড়ি পার্ক করে বসে আছেন। সিগ্রেটও খাচ্ছেন না।'

'আমি সিগ্রেট খাই না।'

'কিন্তু রাত্রে বাড়ি তো ফেরেন? তা ফিরছেন না কেন?'

'আপনার কিছু ক্ষতি করছি তাতে?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, করছেন! আমাকে নজর রাখতে হচ্ছে। আর আধঘণ্টা পরে জায়গাটা খুব নিরাপদ থাকবে না। দু-তিনজন সমাজবিরোধী এসে ছোরা দেখিয়ে আপনার ঘড়ি-আংটি-পার্স কেড়ে নিতে পারে। মায়, গাড়ি থেকে নামিয়ে দিয়ে গাড়িটা নিয়ে হাওয়া হয়েও যেতে পারে। আপনি যদি সুস্থ থাকেন, ড্রিংক্‌স্ না করে থাকেন, এবং কারও প্রতীক্ষায় না থাকেন তবে কাইন্ডলি বাড়ি যান।'

'থ্যাংস্ সার্জেন্ট। আমি স্মোক করি না, তাই আপনাকে একটা সিগ্রেটও অফার করতে পারছি না। কুউ আই....ইন এনি ওয়ে....আই মীন....' মাঝপথেই থেমে যায় হিপ পকেট থেকে ওয়ালেটটা বার করতে করতে।

সার্জেন্ট ঝুঁকে পড়ে হাত বাড়িয়ে চেপে ধরে ওর মণিবন্ধ। বলে, 'ওটা থাক। আপনি যদি কিছু দিতেই চান তাহলে আমার কৌতূহলটা বরং মিটিয়ে দিয়ে যান। মূল্যবান এই জীবনের পাক্কা তিন-তিনটে ঘণ্টা আপনি কেন এভাবে পথের ধুলায় বিকিয়ে দিলেন?'

মুরলীধর ম্লান হাসল। বলল, 'কী জান ভাই, আই হ্যাভ জাস্ট লস্ট আ-গেম। একটা দ্বৈরথ-সমরে চূড়ান্ত হেরে গেলাম বেমক্কা। সেটা সইতে পারছি না। এর আগে কখনো হারিনি তো!'

'বুঝলাম। কিন্তু একটা কথা, স্যার! ডুয়েল লড়বার জন্য খাপ থেকে তরোয়ালটা যখন আপনি বার করেছিলেন তখন কি আপনি জানতেন না যে, খেলায় হারজিত দুটোই থাকে? একপক্ষ যদি অনিবার্যভাবে প্রতিবার জিততেই থাকে তবে তাকে আর 'খেলা' বলে না! প্রাকৃতভাষায় তাকে বলে 'ধাষ্টামো'; শুদ্ধভাষায় 'অসম প্রতিযোগীর উপর বলাৎকার!'

'দ্যাটস্ আ গুড পয়েন্ট। না, ওভাবে কথাটা ভেবে দেখিনি। কী জান সার্জেন্ট, আমি হেরে ঠিক যাইনি। বেমক্কা কুইনটা মারা গেল। তাই একটু মুষড়ে পড়েছি।'

'দাবা খেলার কথা বলছেন, স্যার?'

'হ্যাঁ, চেস। জানো খেলাটা ?'

'তা জানি। কিন্তু আমার ধারণাটা আবার অন্যরকম।'

'কী রকম ?'

'কুইন-কে কেউ চিনতে পারে না। ভিড়ের মাঝখানে কোন এক দীর্ঘাঙ্গী গরবিনী মাথাটা উঁচু করে ছুটোছুটি করে এ কোণ থেকে ও কোণায়, এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্তে। তাই সবাই ভুল করে আঙুল দেখিয়ে বলে—ঐ আমাদের রানী ! আসলে, এই সাদাকালো দাবার ছকে আরও আট দুকুনে ষোলোজন সামান্যাও দু-কুড়ি-সাতের খেলা খেলে চলে। তারা হয়তো মাথায় খাটো, কেউ কালো, কেউ ধলো। ওরা সবাই 'বাসিফুলের মালা', নিতান্ত 'সাধারণ মেয়ে'। তবু প্রথম তারুণ্যে সেই সাধারণীও ঘর ছাড়বার সময় এক-লাফে দু-ঘর এগিয়ে যায়—জীবনে একবার ! তারপর তারা গান শুরু করে—'কে নিবি গো কিনে আমায়, কে নিবি গো কিনে ?' সেই যে-কোন অমলা-সরলা-খেঁদি-পেঁচির হাতটি দৃঢ়ভাবে ধরে যদি ভালবেসে সপ্তপদ গমন করতে পারেন স্যার, তাহলে দেখবেন তারা সবাই 'রানী' হয়ে গেছে। 'রানী' তো কেউ হয় না, স্যার—'রানী' আমরা বানাই।'

মুরলীধর তার সারাদিনের গ্লানির কথা ভুলে গেল। বললে, 'স্প্লেন্ডিড্ ! তুমি কি ভাই পুলিশে চাকরি নেবার আগে কবিতা লিখতে ?'

'আপনার আন্দাজে একটু ভুল হয়েছে, স্যার। ডিউটি অফ্ হলে আজও লিখে থাকি। কিন্তু আর রাত বাড়াবেন না। গুড নাইট।'

এম. ডি. ওর ওয়ালেট থেকে নামাঙ্কিত একটা বিজনেস-কার্ড বার করে বললে, 'অফিসে ফোন করে অ্যাপয়েন্টমেন্ট কর। যেদিন দুজনেই ফ্রি থাকব সেদিন একসঙ্গে কোথাও লাঞ্চ করব। আর সেদিন তুমি তোমার কবিতার খাতাখানা নিয়ে আসতে ভুলবে না কিন্তু।'

॥ দশ ॥

হাউসিং এস্টেটের কম্পাউন্ডে যখন গাড়িটাকে পার্ক করল রাত তখন এগারোটা-দশ। প্রীতিম সিং ছুটে এল। হিন্দিতে জানতে চাইল, 'আজ এৎনা রাত হল কেন, স্যার ?'

এম. ডি. বিরক্ত হল। জবাব দিল না। প্রীতিম সিং বলে, 'ড্যাশ বোর্ডে চাবিটা থাক। আমি গাড়ি গ্যারেজ করে চাবিটা আপনাকে দিয়ে আসছি। আপনি তুরন্ত্ বাড়ি যান। সবাই অপেক্শা করছেন।'

এবার ওর কণ্ঠস্বরে এবং বাচনভঙ্গিতে এম. ডি.-র মনে হল, কিছু একটা ঘটেছে। জানতে চাইল, 'মানে ? ওরা কারা ?'

'আপনি তুরন্ত অ্যাপার্টমেন্টে ওয়াপস্ যান, স্যার।'

এবার মুরলীধর খপ্ করে ওর হাতখানা চেপে ধরে, 'কেন প্রীতম ? কার কী হয়েছে ?'

'খোঁকি-দিদি গির গয়ী। চোট লাগা। লেকিন ডরনেকো কোই বাত নেহি। ডাগ্দার সাবনে খুদ বাতায়া....'

'খোঁকিদিদি ! মামণি ? পড়ে গেছে ? কী করে ?'

প্রীতিম সিং অসহায়ভাবে মাথা নাড়ে। বলে, 'বাৎ মৎ বড়াতে চলিয়ে সাব। উপর যাইয়ে।'

এম. ডি. প্রায় ছুটতে ছুটতে এগিয়ে গেল লিফ্টের দিকে। প্রায় মধ্যরাত্রি। চরাচর নিষুতি হয়ে আসছে। লিফ্টের ওঠা-নামা কমে গেছে। খাঁচাটা নিচেই ছিল। এম. ডি. একক যাত্রী। বোতাম টিপে দিল।

নিজের সদর-দরজার কাছাকাছি এসে পকেট হাতড়ে চাবি বার করার উপক্রম করতেই ক্লিক করে খুলে গেল দরজাটা। প্যাসেজে আলো জ্বলছে,

বৈঠকখানা অন্ধকার, তবু দরজা খুলে ওর সামনে দণ্ডায়মান নারীমূর্তিটিকে দেখে বজ্রাহত হয়ে গেল মুরলীধর।

মিসেস অসীমা কানোরিয়া!

সন্ধ্যাবেলায় যে পোশাকে ওর ইন্টারভিয়ু নিয়েছে সেই পোশাকটা এখনো বদলানো হয়নি।

এম. ডি. কণ্ঠস্বর হারিয়ে ফেলেছে।

অসীমাই একটি হাত বাড়িয়ে চেপে ধরল ওর মণিবন্ধ। বলল, 'ভিতরে এস, মুরলী। খবরটা পেয়ে গেছ মনে হচ্ছে। কিন্তু ভয় পাওয়ার কিছু নেই। তোমাদের হাউসিং এস্টেটের এক ডাক্তারবাবু ওকে দেখে গেছেন। বলেছেন, ভয়ের কিছু নেই। ওকে ঘুমের ওষুধ দিয়েছেন। মামণি এখন ঘুমাচ্ছে। অঘোরে ঘুমাবে সারাটা রাত।'

'কোথা থেকে পড়ে গিয়েছিল সে? হেড ইঞ্জুরি?'

'বিস্তারিত রানীর কাছ থেকে শুনে নিও। বললাম তো, ভয়ের কিছু নেই। কাল সকালের ফ্লাইটেই আমরা জার্কাতা চলে যাচ্ছি। তুমি পরে একটা চিঠিতে জানিও। দুশ্চিন্তায় থাকব।'

মুরলীধর জানতে চায়, 'তুমি এখানে এলে কেমন করে?'

অসীমার পিছনে এতক্ষণে রানী এসে দাঁড়িয়েছে। জবাবটা সে দিল, 'আমিই হোটেল তাজ-বেঙ্গলে ফোন করেছিলাম।'

অসীমা বলল, 'আন্‌ফরচুনেটলি ততক্ষণে তুমি আমাদের ওখান থেকে বেরিয়ে পড়েছ। আর তারপর আমাদের চিন্তা শুরু হল তোমাকে নিয়ে। এইটুকু পথ আসতে তোমার সাড়ে তিন ঘণ্টা লাগছে কেন? তুমিও কি কোন অ্যাক্‌সিডেন্ট বাধিয়ে বসে আছ?'

রানী পিছন থেকে বললে, 'তুমি আর রাত কর না, অসীমা। মিস্টার রামানুজও চিন্তা করছেন ওদিকে। তাছাড়া কাল ভোরে তোমাকে প্লেন ধরতে হবে।'

'দ্যাট্‌স্ টু। সো, গুড-নাইট টু বোথ অব য়ু।'

অসীমা সদর-অতিক্রম করে করিডরে পদার্পণ করে।

রানী তার স্বামীকে বলে, 'ওকে লিফ্‌ট পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে এস।' মুরলীধর এতক্ষণে ধাতস্থ হয়েছে। বললে, 'কিন্তু এত রাত্রে ও একা...' বাধা দিয়ে অসীমা বলে, 'না, না, আমি হোটেলের গাড়ি নিয়ে এসেছি। আমার সঙ্গে আর্মড এস্‌কর্ট আছে। তোমরা চিন্তা কর না।'

ওরা দুজনে পাশাপাশি লিফটের দিকে এগিয়ে যায়। লিফ্‌ট্‌টা নিচে গেছে, ফলে, অপেক্ষা করতে হল। অসীমা বললে, 'তুমি জার্কাতায় আমাকে একটা চিঠি দিয়ে জানিও, মামণি কেমন আছে।'

মুরলী বলে, 'আমি তো তোমার ঠিকানা জানি না।'

'রানী জানে, তাকে আমি ঠিকানা দিয়ে এসেছি। আমিও জাকার্তা থেকে আই. এস. ডি. করে খবর নেব। আজ একেবারে খালি হাতে এসেছিলাম তো। তাই জার্কাতা থেকে একটা 'ডল' পাঠিয়ে দেব। এয়ার-মেলে। ভারি সুইট দেখতে হয়েছে তোমার মামণি।'

এম. ডি.-র, কী জানি কেন, কান্না পাচ্ছে। ধেড়ে ছেলে! কাঁদবে কেন? কোনও মানে হয়? ও কোন কথা খুঁজে পাচ্ছে না। ওর মনে হচ্ছে অসীমা একটা সুন্দর পুতুল ওর দিকে বাড়িয়ে ধরে বলছে, এটা মামণিকে দিও।'

কিন্তু ও যেন কিছুতেই হাত বাড়িয়ে ওটা নিতে পারছে না। কেন? কারণ ওর মনে হচ্ছে ও নতজানু। মনে হচ্ছে ও নগ্ন!

অসীমা বললে, 'তোমার বউ রানী আজ আমাকে একটা প্রেজেন্ট দিয়েছে। জান? সুন্দর একটা স্যুভেনির।'

এম. ডি. কী বলবে ভেবে পেল না। রানী অসীমাকে কী প্রেজেন্ট দিতে পারে? ওরা তো কেউ কাউকে চিনতোই না, নেহাৎ ঘটনাচক্রে আজ মামণির অ্যাকসিডেন্টটা হওয়ায়।...

লিফ্‌টটা এসে দাঁড়াল! অসীমা ভিতরে ঢুকে গেল। দরজাটা বন্ধ হবার আগে বাঁ-হাতটা মেলে ধরল। ওর অনামিকায় চুনি বসানো একটা সোনার আংটি। লিফ্‌টের খাঁচাটা বন্ধ হয়ে গেল!

পায়ে পায়ে এম. ডি. ফিরে এল নিজের সদর দরজার সামনে। দরজাটা খোলা রেখে সেখানে অপেক্ষা করছিল রানী। ওকে আসতে দেখেই ভিতরে চলতে শুরু করল। মুরলীধর সদর বন্ধ করে ওর পিছন পিছন এগিয়ে গেল। দুজনেই এসে উপস্থিত হল মামণির 'ওয়ান্ডারল্যান্ড'-এ।

ঘরটা মামণির। স্রেফ মামণির। দেওয়ালে বড় বড় ব্লো-আপ ছবি। ডোনাল্ড-ডাক, গুফি, মিকি-মিনি, টিনটিন, হ্যাডক, স্নোয়ীর। আর সিন্ডারেলার একটা প্রকাণ্ড স্টেট ক্যারেজ। কাচের আলমারিতে পুতুল। পুতুল আর পুতুল। জিগ্‌স-পাজ্‌ল্‌, ক্রেয়ন পেনসিল, ছবির বই। এদিকে ওর পড়ার টেবিলে পড়ার বই সাজানো। ছোট্ট চেয়ার—মামণির মাপে। ছোট্ট পালঙ্ক—অ্যালিস-সিন্ডারেলার মাপে। বালিশে মাথা রেখে মামণি অঘোরে ঘুমাচ্ছে। ওর ডানহাতটা আবার

বালিশের তলায়। বিকালে যে ফ্রকটা পরে খেলতে গিয়েছিল এখনো সেটাই ওর পরনে। শুধু জুতো-মোজা খুলে নেওয়া হয়েছে। আর মাথার লাল রিবনের বো-টা। কারণ ডাক্তারবাবু মাথায় একটা ব্যান্ডেজ বেঁধে দিয়ে গেছেন। ডেটল আর আয়োডিনের একটা মিশ্র গন্ধ। ওর বাঁ-চোখটা ফুলে ঢেকে গেছে। আঘাতটা লেগেছে বাম-ভ্রূর ঠিক উপরে। মামণির মাথার কাছে বসেছিল নির্মলা। কী একটা জলের পটি দিচ্ছিল কপালে। মনে হল, গুলাডস্ লোশান।

রানী বললে, 'আর জলপটি দেবার দরকার নেই। এবার তুমি বিশ্রাম নিতে যাও, নির্মলা। তোমাদের দুজনের খাবার জালের আলমারিতে রাখা আছে। গৌতমকেও ডেকে নাও। খাওয়া-দাওয়া মিটিয়ে তোমরা শুয়ে পড়।'

নির্মলা জানতে চায়, 'আর আপনারা ?'

'আমাদের দেরি হবে। আমাদের খাবার তো টেবিলে সাজানোই আছে। শুধু মাংসটা আছে হট-কেস-এ। আমরা রাতে খেলে এঁটো বাসন ঐ টেবিলেই পড়ে থাকবে। কাল সকালে উঠে সাফা কর বরং।'

নির্মলা বুদ্ধিমতী। আন্দাজ করল, কর্তা-গিন্নিতে হয়তো এখন একটা বোঝাপড়া হবে। ওর পক্ষে স্থানত্যাগ করাই বুদ্ধিমত্তার পরিচয়। বলল, 'খেয়ে এসে আমি কিন্তু এই মামণির ঘরেই শোব আজ। রাতে যদি ভয়-টয় পায়....'

রানী দৃঢ় অথবা শান্তস্বরে বলল, 'না, নির্মলা। তার দরকার হবে না। কারণ আমিই আজ এ-ঘরে মাদুর পেতে শোব।'

নির্মলা ইতস্তত করল। প্রতিবাদ করতে সাহস পেল না। কী জানি সেটা ওর অধিকার সীমার বাইরে কি না। বাড়ির গিন্নি যদি এই অজুহাতে কর্তার কাছ থেকে আলাদা বিছানা পেতে শুতে চান—সুয়োরানীর ডানলোপিলো গদি ছেড়ে একেবারে দুয়োরানীর মাদুরে—তাহলে দাসীবাঁদীর রা-কাটা কি উচিত ? বিশেষ কর্তাও যখন আগ্‌বাড়িয়ে বল্‌তিছেন না—'না, না, তুমি কেন মাদুরে শুতে যাবে ? ছিঃ !'

নির্মলা চলে যাবার পর এম. ডি. মামণির সামনে হাঁটু গেড়ে বসল। কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে লক্ষ্য করল ওর আহত চোখটা। তারপর জানতে চাইল, 'কোথা থেকে পড়ে গিয়েছিল ? কত উঁচু থেকে ?'

রানী বলল, 'সিঁড়িতে। পাঁচ-সাত ধাপ গড়িয়ে পড়েছে। মাথার পিছন দিকটা সিঁড়ির ব্যালাসট্রেডে ঠুকে গেছিল। ডাক্তারবাবু বলেছেন, ভয়ের কিছু নেই। কালকেই ঠিক হয়ে যাবে।'

এম. ডি. বলে, 'তার মানে ও চিৎ হয়ে পড়েছিল। তাহলে ওর বাঁ-চোখের

উপর আঘাতটা লাগল কেমন করে ?'

'কী লাভ মাঝরাতে সে গবেষণা করে ? তুমি যাও। জামা কাপড় ছেড়ে এস। রাতে খাবে তো ? না, ও পাট একেবারে চুকিয়েই এসেছ ?'

এম. ডি. জবাব দিল না। পায়ে-পায়ে ফিরে এল শোবার ঘরে। যথেষ্ট রাত করে ফিরেছে। সমস্ত বিপদের ঝড়টাই গেছে রানীর উপর দিয়ে। ওদের শয়নকক্ষটা মামণির ঘরের লাগোয়া। দু-ঘরের মাঝে একটা দরজা। রাতে সেটা খোলাই থাকে। যাতে মামণি রাতে ভয় পেলে বা ইচ্ছে করলে গুটি-গুটি ওঘরে চলে আসতে পারে। শুয়ে পড়তে পারে বাপির বা মামির কোল ঘেঁষে। আগে—তিন-চার বছর আগেও—মাঝের ঐ দরজাটা কালেভদ্রে বন্ধ হয়ে যেত। মধ্যরাত্রে অথবা রাতের শেষ প্রহরে। ইদানীং পার্টিশান দরজার পাল্লা দুটো পরস্পরকে স্পর্শ করতেই ভুলে গেছে। যে-যার বাফার-ব্লকের বালিশে মাথা রেখে ঘুমায়। পাল্লা দুটো পরস্পরের স্পর্শ পায়নি অনেকদিন—তা বছরতিনেক হবেই।

এম. ডি. নজর করে দেখল, বিকালবেলা সে যে প্যান্ট-শার্ট ডিভানের উপর ছড়িয়ে ছিটিয়ে ফেলে রেখে গিয়েছিল সেগুলি অপসারিত। শয্যার মাঝখানে অ্যাশট্রেটাও নেই। স্যুটটা খুলে হ্যাঙারে ঝুলিয়ে আলমারিতে তুলে রাখল। নিত্যকর্ম পদ্ধতির আইনে মুরলীর মাথার বালিশের উপর রাখা আছে ওর রাতের পোশাক—পাজামা, গেঞ্জি। তুলে নিয়ে এম. ডি. সংলগ্ন ড্রেসিং রুমে চলে গেল।

শয়নকক্ষে ফিরে এসে দেখল রানী ইতিমধ্যে তার রাতের আটপৌরে মিলের শাড়িখানা পরে নিয়েছে। হঠাৎ এম. ডি.-র মনে পড়ে গেল দাদীমার সেই কথাটা। চোখ তুলে লক্ষ্য করে দেখল—না! রানী নেল পালিশ ব্যবহার করেনি। লিপস্টিকও নয়। মাথাতেও শ্যাম্পু দেয়নি। বোধকরি বহুদিন এসব ব্যবহার করে না। কে জানে ? দুজনে একসঙ্গে বাজারই করেনি বহুদিন।

এম. ডি. বেডরুমে এসে বসল। রানীও বসে আছে একটা ডিভানে। এম. ডি. জানতে চায়, 'অসীমাকে একটা আংটি দিয়েছ দেখলাম। ওটা কোথায় পেলে ?'

হাসল রানী। বলল, 'তোমার খেয়াল নেই ? তোমার ছেড়ে যাওয়া প্যান্টের পকেটে ছিল।'

'—ওটা অসীমাকে দিতে গেলে কেন ?'

'তাও আমাকে বুঝিয়ে বল্‌তে হবে ? ওটা তো ওরই! তুমিই তো ওটা অসীমাকে দিয়েছিলে এককালে। তাই না ? ওকে দেখাতেই ও চিনতে পারল। রাতে খাবে তো ? তাহলে চল।'

'বস। কথা আছে। প্রথম কথা বুঝিয়ে বল দেখি, মামণির কপালে চোটটা লাগল কেমন করে? তুমি ওকে মেরেছিলে?'

'আমি? ওকে? কেন? আমি মারতে যাব কেন?'

'সেটা তুমিই জান। হয়তো আমার উপর রাগ করে মেয়েকে ধরে ঠেঙিয়েছ!'

রানীর ঠোঁট দুটি নড়ে উঠল। কী যেন বল্‌তে গেল। তারপর সামলে নিয়ে আপনমনে বলে ওঠে, 'পিতেব পুত্রস্য সখেব সখুঃ, প্রিয় প্রিয়ায়ার্হসি দেব সোঢুম।'

ডি. এম. বলে, 'কী বিড়বিড় করছ?'

'কিছু না। জোরে-জোরে বললেও বুঝতে না তুমি। তবে তুমি যা জানতে চাইছ তার জবাব—না, আমি মারিনি। মামণি নিজেই একটি মেয়ের সঙ্গে মারামারি করেছে। এই অ্যাপার্টমেন্টেরই মেয়ে।'

এম. ডি. উঠে দাঁড়ায়। বলে, 'কী বলছ রানী! একটা মেয়ে মামণিকে এভাবে মেরেছ? কে সে? কত বড় মেয়ে?'

'কে তা তোমার শুনে কাজ নেই। মেয়েটার বয়স বছর তের-চোদ্দ। টীন-এজার অ্যাডোলেসেন্ট। তার মামা ডাক্তার। খবর পেয়ে ছুটে এসেছিলেন। তিনিই ওষুধপত্র দিয়েছেন, ব্যান্ডেজ বেঁধে দিয়ে গেছেন। তাঁর স্ত্রীও এসেছিলেন। ঐ মেয়েটির মামিমা! অনেকক্ষণ ছিলেন। আমার হাতে ধরে ক্ষমা চেয়ে গেছেন। সে যা হোক, এস—'

ডি. এম. ধম্‌কে ওঠে, 'ব্যস! উনি হাতে ধরে ক্ষমা চাইলেন আর তুমি গলে গেলে। ক্ষমা করে দিলে!'

হঠাৎ রুখে উঠল রানী। মুহূর্তের জন্য ভুলে গেল কুমুদিনীর সেই মন্ত্রটা—অর্জুনের সেই প্রার্থনা মন্ত্রটা: 'প্রিয়ায়ার্হসি দেব সোঢুম!' বললে, 'হ্যাঁ, দিলাম! তুমি হলে কী করতে? নগদ টাকা ক্ষতিপূরণ দাবী করতে?'

'শাট্ আপ্! বাজে কথা একদম বলবে না! হ্যাঁ, আমি উপস্থিত থাকলে সেই ধাড়ি মেয়েটাকে তার চুলের মুঠি ধরে টেনে আনতাম। ধরে ঠ্যাঙাতাম! আনতাম কেন? আনব। কাল সকালে। ধরে ঠ্যাঙাবো।'

রানী জবাব দিল না। দু-হাঁটুর মধ্যে থুৎনিটা রেখে মেদিনীনিবদ্ধদৃষ্টিতে সে যেন কিছু ভাবছে।

এম. ডি. তাগাদা দেয়, 'কী হল? জবাব দিলে না যে?'

'আমি ভাবছি।'

'কী ভাবছ ?'

'আজ থেকে আট-দশ বছর পরে এই অ্যাপার্টমেন্টের আর এক পুরুষসিংহ যখন মামণির চুলের মুঠি ধরে টেনে নিয়ে যাবে, ঠিক সেই মুহূর্তে তুমি-আমি কী করছি, মুরলী ? আমরাও তো তখন জানতে পারব না যে, মামণিকে ধরে সেই পুরুষসিংহটি বেধড়ক ঠেঙাচ্ছে ! তাই নয় ?'

'তার মানে ? ঐ ধেড়ে মেয়েটার বাপ-মা কোথায় ? তারা এখানে থাকে না ?'

'না ! তারা ডিভোর্স করেছে। নতুন নতুন জীবনসাথী বেছে নিয়েছে। তাই ঐ মেয়েটা মানুষ হচ্ছে মামা-মামীর সংসারে। তোমার-আমার ডিভোর্স হয়ে যাবার পর মামণি যেমন মানুষ হবে কোনও আত্মীয়ের সংসারে অথবা অনাথ আশ্রমে !'

মুরলীধর ঢোক গিলে বললে, 'তোমার আমার ডিভোর্স হয়ে যাবেই ? তুমি নিশ্চিত ?'

'তাই তো তুমি চাও ! চাও না ? অন্তত সেই রকমই প্রত্যাশা করছে মিস ডরোথি সাক্সেনা। করছে না ?'

ভ্রূকুঞ্চন হল এম. ডি.-র। বললে, 'কে ডরোথি সাক্সেনা ? সে কে ?'

'তোমার রিসেপ্‌শানিস্ট। যার সঙ্গে জয়েন্ট-ভল্ট খুলে আমাদের জয়েন্ট-ভল্ট থেকে ক্রমাগত টাকা সরাচ্ছ। যার সঙ্গে অনেক অনেক হোটেলে মিস্টার অ্যান্ড মিসেস্ রাকেশ সাক্সেনা পরিচয়ে রাত্রিবাস করেছ !'

এম. ডি. স্তম্ভিত হয়ে যায়। রানী কেমন করে জানল এসব কথা ? সবই আন্দাজে ঝাড়ছে ? অফেন্স ইজ দ্য বেস্ট ডিফেন্স ! বললে, 'বলছি। কিন্তু তার আগে তুমি কি অনুগ্রহ করে জানাবে : আজ দুপুরে তুমি কোথায় গিয়েছিলে ? কার সঙ্গে গিয়েছিলে ? আর কেন গিয়েছিলে ?'

রানী বিকালে গা ধোবার সময় পায়নি। প্রসাধন করেনি। নেলপালিশ. লিপস্টিক, শ্যাম্পু কিছুই ব্যবহার করেনি। রাতে পরে শোবার আটপৌরে শাড়িখানা সাধারণ ভাবে পরেছে। তাকে এখন দেখলে সেই নাম-না-জানা কবি-সার্জেন্ট বোধ করি বলত—'বাসিফুলের মালা' অথবা 'সাধারণ মেয়ে।' সেই অমলা-সরলা খেঁদি-পেঁচির দলের প্রতিনিধি হিসাবে রানী তার বড় বড় চোখ মেলে বললে, 'হ্যাঁ বলব ! আজ বলব। আজই বল্‌ব ! আমি গিয়েছিলাম লিট্‌ল রাসেল স্ট্রিটের একটা স্বপ্নপুরীতে। সেখানে মাঝে মাঝেই একটা মধুচক্রের আসর বসে। মক্ষীরানী অবশ্য আজ ছিলেন না ;—থাকবেন না আমি জানতাম—আমি

গেছিলাম তাঁর লেডি কম্পানিয়ানের কাছে। কেন গেছিলাম ? তাকে কিছু টাকা খাইয়ে জানতে গেছিলাম যে, ঐ মধুচক্রে মাঝে মাঝে এক ধনকুবের আসেন,—'নভো রিশ্'—যাঁর কোড নাম, 'এম-থ্রি'।—সেই ভাগ্যবানটির আসল নামটা কী ?'

মুরলীধরের আজ বোধহয় বিস্মিত হবার অনুভূতিটা ভোঁতা হয়ে গেছে। সে পাথরের মূর্তির মতো নির্নিমেষ নেত্রে রানীর দিকে তাকিয়ে স্থাণুর মতো বসে থাকে।

'ও—আর হ্যাঁ, কার সাথে গেছিলাম জানতে চেয়েছিলে তুমি ! নামটা শুনে লাভ নেই। তিনি একজন প্রাইভেট ইন্‌ভেস্টিগেটার। বিয়ে করে যারা সুখী হয়নি, হয় না, বিচ্ছেদ চায়, তাদের অর্থমূল্যে সাহায্য করে থাকেন। যেমন আমাকে বর্তমানে করছেন।'

মুরলীধর ঢোক গিলে জানতে চায়, 'তুমি তাঁর সন্ধান পেলে কোথায় ?'

'আমাকে খুঁজতে হয়নি। বাপি ওঁকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, আমাকে সাহায্য করতে। তুমি যেমন এ বন্ধন থেকে মুক্তি পেতে চাও, তিনিও তেমনি চাইছেন, যাতে তাঁর একমাত্র মেয়েটা মুক্তি পায়।'

'বুঝলাম। তিনি কি এ নির্দেশও দিয়েছিলেন যে, ঐ প্রাইভেট ইন্‌ভেস্টিগেটারকে নির্জন দুপুরে আমাদের বেড রুমে নিয়ে আসতে ? যখন আমি অফিসে, মেয়ে স্কুলে, যখন ঝি-চাকরেরা ফ্রেণ্ড লীভে বাড়িতে নেই ?'

রানী ওর চোখে-চোখে তাকিয়েই জবাব দিল, 'না, মুরলী। এটা তাঁর নির্দেশে নয়। লোকটা আমার উপকার করছে, সাহায্য করছে, আমাকে মুক্তি দিতে চেষ্টা করছে তো, তাই তার প্রতি একটা.....'

মুরলী বাধা দিয়ে চাপা গর্জন করে ওঠে, 'তাই বলে তার সঙ্গে এক বিছানায় শুতে হবে ?'

'কেন নয়, মুরলী ? এটা 'উইমেন্স লিব'-এর যুগ। তোমার-আমার সমান অধিকার।—সপ্তপদীর শর্ত মানার। সপ্তপদীর শর্ত ভাঙার। সব, সব বিষয়ে। এমন কি অ্যাডালটারিরও। তাই নয় ? তার মানে আমি এ কথা বলছি না যে, ওর সঙ্গে নির্জন দুপুরে এক বিছানায় শুয়েছি ! আসলে আমাদের দুজনের আলোচ্য বিষয়বস্তুটা—অর্থাৎ তোমার বহুমুখী ব্যভিচার—সেটা যাতে নির্মলা বা গৌতমের কানে না যায়, তাই আমাকে সাবধান হতে হয়েছিল, তাই ওকে এ ঘরে নিয়ে আসি। দরজা বন্ধ করে আলোচনা করি। আর—তাই মামণি এ ঘরে বাপি-বাপি গন্ধ পায়, তুমি আমাদের শোবার ঘরে আচমকা অ্যাশট্রে আবিষ্কার করে চমকে ওঠ।—না, না, মুরলী, যা ভাবছ না নয় ! ভুল বুঝ না আমাকে ! আমি

এভাবে কোন কৈফিয়ৎ দিচ্ছি না। অর্থাৎ, আমি এ কথা বলছি না যে, উপেক্ষিতা, বিবাহিতা রমণীর অতৃপ্ত কামনা চরিতার্থ করতে ওকে নিয়ে আমি এক বিছানায় শুইনি.....'

এম. ডি. গর্জন করে ওঠে, 'য়ু কান্ট ইট দ্য কেক অ্যান্ড হ্যাভ ইট! দু-নৌকায় পা দিয়ে চলতে চাইছ কেন রানী? হয় তোমরা দুজন....'

একটা হাত তুলে রানী ওকে মাঝপথে থামিয়ে দেয়। বলে, 'আস্তে কথা বল মুরলী। পাশের ঘরে মামণি ঘুমাচ্ছে! যুক্তির খাতিরে আই অ্যাডমিট : আই কান্ট ইট দ্য কেক অ্যান্ড হ্যাভ ইট! প্রশ্ন সেটা নয়। প্রশ্ন : এ সওয়ালটা পেশ করছে কে? রাকেশ সাক্সেনা না 'এম-থ্রি?' জবাবটা কাকে শোনাব?'

মুরলী জবাব খুঁজে পায় না।

রানীই আবার বলে, 'তোমার খেয়াল নেই যে, প্রবাদবাক্যটা তোমার-আমার প্রতি সমানভাবে প্রযোজ্য : 'য়ু কান্ট ইট দ্য কেক অ্যান্ড হ্যাভ ইট অ্যাজ ওয়েল!' রাকেশ আর এম-থ্রি আকণ্ঠ কেক গিলে বসে আছে! ফলে প্রশ্ন পেশ করার অধিকার তাদের নেই! এই আর কি!'

দুজনেই কিছুটা চুপচাপ। শুধু স্তব্ধ রাত্রে ঘড়িটার টিটকারি। হঠাৎ প্রসঙ্গান্তরে আসতে চাইল মুরলী। বললে, 'মামণির সঙ্গে মেয়েটির বচসা হয়েছিল কী নিয়ে? তুমি শুনেছ?'

'হ্যাঁ, শুনেছি। কিন্তু সে-কথা জানতে চেও না তুমি।'

'কেন? তুমি যখন মা হয়ে জেনেছ, তখন বাপ হয়ে আমিই বা জানব না কেন?'

'অহেতুক মনঃকষ্ট পাবে বলে। বেশ, শোন :

মামণি বিকালে তার স্কিপিং রোপ নিয়ে ছাদে গিয়েছিল। সমবয়সী বান্ধবীদের জ্ঞানদান করেছিল : সিগ্রেট খেলে হার্ট অ্যাটাক হয়, ক্যান্সার হয়। তাই তার মাম্মি কত বলে-বলে-বলে তার বাপিকে ঐ বদ অভ্যাস ছাড়িয়েছে। বাপি আর সিগ্রেট খায় না। কিন্তু হলে কী হবে, মাম্মি নিজেই পড়ে গেছে ঐ নেশার খপ্পরে। মাম্মি নিজেই এখন স্মোক করতে শুরু করেছে। এখন বোঝ ঠেলা! তখন ওর এক বান্ধবী নাকি জানতে চেয়েছিল, 'তুই কেমন করে জানলি? তুই মাম্মিকে সিগ্রেট খেতে দেখেছিস কখনও?'

মামণি তার ঝাঁকড়া চুল-সমেত মাথাটা নেড়ে বলেছিল, না, তা সে দেখেনি বটে, তবে স্কুল থেকে ফিরে এসে ও মাঝে-মাঝে একটা অদ্ভুত গন্ধ পায়। ড্যাডি-মাম্মির বেডরুমে। বাপি-বাপি গন্ধ! প্রথমটা বুঝতে পারেনি। এখন

বুঝেছে, সেটা সিগ্রেটের গন্ধ।

ঐ মেয়েটা ছিল কাছেই। বাপ-মা পরিত্যক্ত অনাদৃত ঐ কিশোরী মেয়েটি। যে করুণার ভিখারিণী, মামা-মামির কাছে মানুষ হচ্ছে। সে এগিয়ে এসে মামণিকে অযাচিত জ্ঞান দান করতে চায়। তার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে। সে বেচারিও ঐ একই ভুল করেছিল যে! তার মায়ের অবৈধ প্রণয়ী খেত সিগ্রেট, আর ও ভাবত মা লুকিয়ে লুকিয়ে বুঝি সিগ্রেট খায়। মামণি তত্ত্বটা বুঝতে পারে না। মেয়েটিও ওকে না বুঝিয়ে ছাড়বে না। রাগ করে বলেছিল, 'তোকে যখন বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়ে বাপি আর মাম্মি নোতুন নোতুন বিয়ে করতে যাবে তখন বুঝবি পোড়ারমুখী!'

মামণি দুরন্ত রাগে ওর হাত কামড়ে দেয়। ওরা তখন সিঁড়ির মাথায়। মেয়েটি ওকে একটা ঘুষি মারে বাম ভ্রূর উপর। মামণি সিঁড়ি দিয়ে গড়িয়ে ল্যান্ডিঙে পড়ে যায়!

॥ এগারো ॥

রাত দুটো বাজল। ঘুম কি আজ আর আসবে না? এম. ডি. উঠে বসল। মাঝের পার্টিশান-দরজাটা প্রতিদিনের মতোই হাট করে খোলা। এতদিন সেটা খেয়াল হত না। আজ হল। ও এ-ঘরে একা আছে বলেই কি? ও-ঘরে একটা স্তিমিত সবুজ আলো। এম. ডি. ধীর পায়ে পালঙ্ক থেকে নামল। মশারি নেই। এ ফ্ল্যাটে মশা নেই। তা ছাড়া এয়ারকন্ডিশান করা ঘরে মশার প্রবেশ-পথও নেই। এম. ডি. পুবদিকের বড় জানলাটার ধারে গিয়ে দাঁড়ালো। পেলমেট থেকে মেঝে পর্যন্ত সুদীর্ঘ ট্যাপেস্ট্রি। স্টেনলেস-স্টিলের বব ধরে টানল। বিরাট প্লেট গ্লাসের জানলাটা অবগুণ্ঠনমুক্ত হল। নিচে রাতের কলকাতা। মধ্যরাত্রেও দু-একটা নিশাচর মটোরগাড়ির ছোটাছুটি। ফুটপাথের বাসিন্দারা ঘুমিয়ে পড়েছে তাদের ঝুপড়িতে। দু-একটা কুকুরের সান্ধ্য বিতর্ক এই মধ্যরাত্রেও মেটেনি। কাচ ও ইটের বজ্র বাঁধুনি ভেঙে এই এয়ারকন্ডিশান ফ্ল্যাটের ভিতরেও শোনা যাচ্ছে তাদের কণ্ঠস্বর।

ধীর পায়ে প্যাটেল এগিয়ে এল মাঝের পার্টিশান দরজার কাছে।

মার্মণি অঘোরে ঘুমাচ্ছে তার ছোট্ট খাটে।

মাটিতে মাদুর পেতে শুয়ে আছে তার মা।

মার্মণির খাটখানি এতো ছোট যে, তাতে মা-মেয়ে দুজনের ঠাঁই হওয়া শক্ত।

মুরলী ধীর পায়ে ও ঘরে গিয়ে রানীর পায়ের কাছে দাঁড়াল। নিঃশব্দে। ও জেগেই ছিল। বললে, 'ঘুম আসছে না বুঝি? ঘুমের ওষুধ খেয়েছ?'

প্রশ্নের সরাসরি জবাব না দিলে মুরলী বললে, 'ঘুম তো দেখছি তোমারও আসছে না।'

রানী জানতে চায়, 'রাতে কোথাও ডিনার খেয়েছিলে তো ?'

মুরলী স্বীকার করে, 'আজ দিনটাই খারাপ ! ডিনার 'দূরস্ত', লাঞ্চও জোটেনি বরাতে। সেই সাত-সকালে যে ব্রেকফাস্ট খেয়ে....'

কথাটা শেষ হল না। রানী মাঝপথেই বলে উঠল, 'সেই জন্যে খালি পেটে ঘুম আসছে না। কিছু খাবে ? খান দুই রুটি আর একটু চিকেন ? অল্প করে খাও, তা হলে ঘুমটা আসবে।'

'খাব। যদি তুমিও সঙ্গ দাও। তুমি নিজেও তো ডিনার খাওনি। মামণিকে নিয়ে সন্ধ্যা থেকেই....'

'তাহলে এস ডাইনিং হলে।'

ক্যাসারোল পটে হাতে-গড়া রুমালী রুটি আর হটকেসে চিকেন কাবাব তৈরি করাই ছিল। দুজনে দুটো প্লেটে বেড়ে নিল।

মুরলী বললে, 'একটা কথা জিজ্ঞেস করব ?'

রানী তৎক্ষণাৎ বললে, 'প্লীজ না ! খেয়ে উঠে।'

নিঃশব্দে দুজনে আহার সারল। বেসিনে মুখ ধুয়ে আবার ফিরে এল ওদের শোবার ঘরে। মুরলী বিছানায় উঠে বসল। একটু দূরে দাঁড়িয়ে আঁচলে হাত মুছতে মুছতে রানী জানতে চায়, 'তখন কী যেন জানতে চাইছিলে, আমি বাধা দিয়ে বলেছিলাম, 'পরে শুনব'। কী কথা ?'

আমি জিগ্যেস করছিলাম : ডিভোর্সটা হয়ে গেলে তুমি কি ঐ ভদ্রলোককেই বিয়ে করবে ?'

রানী ম্লান হেসে বলল, 'নিশ্চয় নয়, উনি বিবাহিত।'

'তাহলে আপাতত কী করবে ? বাবার কাছে গিয়ে থাকবে ?'

'না। মা থাকলেও না হয় সেটা সম্ভবপর ছিল। এখন আর সেটা সম্ভবপর নয়।'

রানীর মা ওদের বিবাহের বছরতিনেক পরে মার যান।

মুরলী জিগ্যেস করে, 'কেন ? এখন সেটা সম্ভবপর নয় কেন ?'

'ও তুমি বুঝবে না।'

'না বোঝার কী আছে ? বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করে দেখ না—ঠিকই বুঝব।'

'বেশ, শোন তবে। আমি তোমাকে বিয়ে করেছিলাম জেদ করে, বাড়িতে ঝগড়া করে। তুমি জান, বাপির প্রবল আপত্তি ছিল। মা তোমাকে পছন্দ করেছিল, মনে মনে আমার নির্বাচনকে সে সমর্থনও করেছিল, কিন্তু বাপির প্রচণ্ড ব্যক্তিত্বের বিরুদ্ধে সে আমার পাশে এসে দাঁড়াতে পারেনি। বাপির কেন আপত্তি ছিল তাও

তুমি জান। জাত-পাতের জন্যে নয়। আমরা বাঙালী—তোমরা গুজরাতি, এজন্যও নয়। তিনি গোপনে সন্ধান নিয়ে জেনেছিলেন : তুমি অসৎ এবং লম্পট! আমি তখন বিশ্বাস করিনি, তা মানতে পারিনি। মাও তা বিশ্বাস করেনি, কিন্তু প্রতিবাদও করেনি। তুমি আমাকে নিয়ে ইলোপ করেছিলে! মনে পড়ে!'

'আমার স্মৃতিশক্তি অত দুর্বল নয়। মাত্র আটবছর আগেকার ঘটনা। মনে পড়বে না কেন? কিন্তু তাতে কী হল?'

'আমি বোকার মতো বিশ্বাস করেছিলাম : আমরা ইলোপ করছি এজন্য যে, তুমি আমাকে প্রচণ্ড ভালবাস। আমি বিশ্বাস করেছিলাম, আমি শুধু তোমাকে ভালবাসি এটাই শেষ কথা নয়; আমি তোমার একান্ত প্রেম কেড়ে নেবার সৌভাগ্য লাভ করেছি। মীরা নয়, অসীমা নয়, জয়তী নয়, তুমি আমার হাত ধরেই জীবনসমুদ্রে পাড়ি জমালে....'

'সো হোয়াট?'

'এখনো বুঝলে না? তিল তিল করে জীবন দিয়ে আমি বুঝেছি, আমি তোমাকে ভুল বুঝেছিলাম। তোমার সেই দুঃসাহসিক ইলোপমেন্টের মূলে ছিল না—আমার প্রতি ঐকান্তিক প্রেম। তুমি শুধু চেয়েছিলে তোমার শ্বশুরের নাকে ঝামা ঘষে দিতে। কারণ কর্নেল সিনহাই এ দুনিয়ার একমাত্র ব্যক্তিত্বসম্পন্ন কন্যার পিতা যিনি তোমাকে তোয়াজ করার পরিবর্তে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন—কারণটা জানিয়ে, তাঁর স্বভাবসুলভ স্পষ্টবক্তার ভঙ্গিমায়। তুমিই বল মুরলী—আজ মা পর্যন্ত নেই—আমি কোন্ লজ্জায় আট বছর পরে সেই বৃদ্ধ মিলিটারি রিটায়ার্ড অফিসারটির সামনে গিয়ে দাঁড়াব? কোন্ মুখে তাঁকে বলব,—তুমিই ঠিক বুঝতে পেরেছিলে বাপি, লোকটা সত্যিই ঘুষখোর আর চরিত্রহীন! তাই আমরা দুটি অনাথা মা-মেয়ে তোমার আশ্রয়ে ফিরে এসেছি।'

হেরে গেছে। মর্মান্তিকভাবে হেরে গেছে। শুধু অসীমা কানোরিয়ার কাছেই নয়--কর্নেল সিন্‌হার কাছেও, রানীর কাছেও।

'আর তা ছাড়া তুমি তো জানই—বাপি তাঁর উইলে সমস্ত জীবনের উপার্জন একটি অনাথ আশ্রমকে দান করে দিয়েছেন। আমার সম্মতিক্রমেই। আমার জীবনে অর্থাভাব হবে না—এই রকম একটা ভ্রান্ত বিশ্বাসে আমি রাজি হয়েছিলাম বাপির প্রস্তাবে। আমার জীবনসঙ্গী নির্বাচনের ভ্রান্তির জন্য সেই অনাথ আশ্রমের মেয়েগুলো কেন অহেতুক বঞ্চিত হবে? ওদের জীবনে দুঃখের বোঝা বোধহয় মামণির চেয়েও বেশি।'

'তা হলে তুমি কী করবে? কোথায় যাবে?'

'আমি একটা নারী-কল্যাণ আশ্রমের স্কুলে ছোট ছোট মেয়েদের পড়াব। মামণিও কনভেন্ট স্কুলে নাম কাটিয়ে সেই স্কুলে ভর্তি হবে। ওরা কোয়ার্টার্স দেবে। মা-মেয়ে সেখানেই থাকব।'

'মামণি আর কনভেন্ট-স্কুলে পড়বে না?'

'না। সেটা সম্ভবপর নয়। আর্থিক কারণে। তাছাড়া বোধ করি বাঞ্ছনীয়ও নয়।'

'কিন্তু তুমি কেন ধরে নিলে, এ চাকরিটা পাবেই?'

'হ্যাঁ, পাব। আমি ইন্টারভিয়ু দিয়ে এসেছি। মামণির ইন্টারভিয়ুও হয়ে গেছে। আসলে বাপিই ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। বাপি ঐ নারী-কল্যাণ আশ্রমের একজন বড় পেট্রন।'

'ও! তার মানে তুমি একেবারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তলে-তলে সব ব্যবস্থাই করে রেখেছ?'

'তলে-তলে বলছ কেন, মুরলী? ডিভোর্স তো তুমিও চাইছ।'

'কে বললে?'

'আমি। তলে-তলে করছ কি না তুমিই জান, কিন্তু আমাকে না জানিয়ে আমাদের জয়েন্ট-অ্যাকাউন্ট থেকে, জয়েন্ট-ভল্ট থেকে তুমি ক্রমাগত গহনা, টাকা তুলে অন্যত্র রাখছ। যাতে বিবাহ-বিচ্ছেদের সময় তোমার অ্যাসেটটা কম থাকে। এইসবই তো কদিন ধরে নিজে-চোখে দেখে বেড়াচ্ছি, মুরলী। তারপরও আমার পক্ষে নিজের ভবিষ্যৎ, মেয়ের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করতে হবে না?'

মুরলী কোনক্রমে বললে, 'আমি কি এমনই পিশাচ যে, আমার স্ত্রীকে, আমার কন্যাকে পথে বসিয়ে দিতাম?'

'না। সম্ভবত নয়। হয়তো আমাকে না জানিয়ে আমাদের জয়েন্ট-অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা সরানোর কোনও যুক্তিযুক্ত হেতু আছে। আমি জানি না—জানতে চাইও না। হয়তো বিবাহবিচ্ছেদ সুসম্পন্ন হলে তুমি আমার এবং আমার মেয়ের ভরণপোষণের জন্য কিছু নগদ টাকা বা মাসোয়ারার ব্যবস্থা করতে। আদালত-নির্দেশে তা 'অ্যালিমনি' না হলেও। কিন্তু মুরলী, তা কি আমি হাত পেতে নিতে পারি? আমি তো তোমার সঙ্গে আট-আটটি বছর ঘর করেছি। টাকা—তা সে শাদাই হোক অথবা কালো—তার প্রতি তোমার যে কী অপরিসীম আসক্তি, তা তো আমি জানি! এই রাজপ্রসাদের অন্দরমহলের সব কিছুই যদি এককথায় ছেড়ে যেতে পারি, তাহলে ওটুকু করুণার ভিখারী কেন হব? আফটার অল, 'হিমালয়ান ব্লান্ডার'টা তো আমারই। মানুষ চিনতে ভুল করা। তাই শাস্তিটাও

আমাকে মাথা পেতে নিতে হবে!'

কিন্তু মামণি? সে কেন সাফার করবে?'

'করবে, যে-হেতু কালটা একশ বছর এগিয়ে গেছে। তুমি হুবহু মধুসূদন, আমি কুমুদিনী হবার চেষ্টা করছি।' কিন্তু 'যোগাযোগের' কালটাকে আমরা পিছনে ফেলে এসেছি। বুঝলে না তো? ও তুমি বুঝবে না। কিন্তু এটুকু নিশ্চয় জানো নাবালক সন্তানের উপর পিতার চেয়ে মায়ের অধিকারটাই এ-কালে স্বীকৃত! মামণি 'সাফার' করবে না, করত যদি মধুসূদনের যুগটা অপরিবর্তিত হয়ে টিকে থাকত। আজকের উচ্চবিত্ত আর মধ্যবিত্ত সমাজ-ব্যবস্থায় দাম্পত্যজীবনের ট্র্যাজেডিটার কথা কখনো ভেবে দেখেছ মুরলী? স্বামী-স্ত্রী পাপ করে, আর প্রায়শ্চিত্ত করে হতভাগ্য ছেলেমেয়ের দল। মামণি একদিন বড় হবে, বুঝতে শিখবে। অনুভব করবে—কেন তার মা বাবাকে ত্যাগ করে গেছিল তার শৈশবে। সেদিন সে কী মর্মান্তিক আহত হবে তা তুমি না বুঝলেও আমি বুঝি। কারণ আদর্শবাদী শ্রদ্ধেয় পিতার সন্তান হওয়ার দুর্লভ সৌভাগ্য আমার নিজের হয়েছে। তাই আমি জানি, বুঝি।'

মুরলী কথা ঘোরাবার জন্য প্রশ্ন করে, 'মামণির জন্যে তোমার দুঃখ হবে না? তোমার জিদ্দিবাজির জন্য সে ভাল কনভেন্ট স্কুল ছেড়ে কোন এক অনাথ আশ্রমে....'

বাধা দিয়ে রানী বলে, 'তোমার তাই মনে হচ্ছে। হয়তো প্রথম প্রথম মামণিরও তাই মনে হবে। ক্রমে সে যখন তোমাকে ঘৃণা করতে শুরু করবে....না, মুরলী, অহেতুক বাধা দিও না—কথাটা নির্মম, কিন্তু অনিবার্য, অমোঘ সত্য, তা তুমিও বুঝছ; কিন্তু কী আর করা যাবে? তুমি আমাকে নিয়ে কোনদিনই সুখী হতে পারবে না।'

'কেন? কেন ধরে নিচ্ছ যে আমি পারব না?'

'যেহেতু তোমার-আমার জীবনদর্শনে আসমান-জমিন ফারাক। আটবছর ধরে মানিয়ে নেবার কত রকম চেষ্টাই তো করে দেখলাম। কী ফল হল?'

'এত বৈভবের মধ্যেও তুমি যে সুখী নও, এ-কথা কি কোনদিন বলেছ? আমি জানব কী করে?'

রানী আবার বিষণ্ণ হাসল। বলল, 'তুমি যে ঝোঁকের মাথায় আমাকে নিয়ে পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করে অনুতপ্ত হয়েছ, এ-কথাই কি তুমি কোনদিন আমাকে বলেছ? অথচ আমি তো ঠিক বুঝতে পেরেছি।'

মুরলী অনেকক্ষণ চুপ করে থাকে। তারপর বলে, 'আমি কি তোমার

আশ্রমে মামণিকে দেখতে যেতেও পারব না ?'

'কেন পারবে না ? আইনত কোন বাধাই থাকবে না। কিন্তু দুদিন পরে তুমি নিজেই আর আসতে চাইবে না।'

'কেন, কেন ?'

'ঐ যে হতভাগীটাকে কাল চুলের মুঠি ধরে টেনে এনে ঠেঙাবে বলছিলে, তার বাবাকে গিয়ে জিজ্ঞেস কর। তিনি বোধহয় তোমার কৌতূহলটা চরিতার্থ করতে পারবেন। কেন তিনি তাঁর সম্বন্ধীর বাড়িতে তাঁর ফেলে যাওয়া মেয়েটাকে দেখতে আসেন না।'

'কেন ?'

'যেহেতু তিনি বুঝতে পারেন, মামার বাড়িতে মানুষ হওয়া ঐ টীন-এজার মেয়েটা তার বাপিকে ঘৃণা করে! প্রচণ্ড ঘৃণা করে।'

মুরলী আবার অনেকক্ষণ কী যেন ভাবল। তারপর বলল, 'তোমার এই সিদ্ধান্তটা কি কোন রকমেই বদল করা যায় না ?'

'কেন ? তুমি কি বিবাহ-বিচ্ছেদটা চাইছ না ?'

'না! নিশ্চয় না! আমি জীবনে কখনো কোথাও হার স্বীকার করে পেছিয়ে আসিনি, রানু। তুমি কি আমাকে একটা চান্স দিতে পার না ?'

ম্লান হাসল রানী। বলল, 'কিসের চান্স ? আদ্যন্ত নিজের চরিত্রটা সংশোধনের ?'

'হ্যাঁ, তাই! তুমি তো জান, বিশবছরের বদ-অভ্যাসটা আমি একদিনেই ছেড়ে দিতে পেরেছিলাম। আই মীন স্মোকিংটা।'

'তুমি ভুল করছ, মুরলী। ধূমপানটা ছিল একটা বদ অভ্যাস। আর এটা যে তোমার চরিত্রের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।'

'এটা বলতে কোনটার কথা বলছ ?'

'তোমার গোটা জীবনদর্শনটা। নিত্য-নতুন নারীর দেহ সম্ভোগের কামনা, যেন-তেন-প্রকারেণ টাকা কামানো। আমি যে দুটোকেই অন্তর থেকে ঘৃণা করি, মুরলী। তোমার পরস্ত্রীকাতরতা—'

'পরশ্রীকাতরতা ?'

'না। আমি 'পরস্ত্রীকাতরতা' বলেছি। শব্দটা অভিধানে নেই। কিন্তু নিজের অন্তরের দিকে তাকিয়ে দেখলেই তুমি বুঝবে তার অর্থটা।

'দ্বিতীয়ত, ঘুষ! তুমি যা মাহিনা পাও তাতে আমাদের সচ্ছলভাবে চলে যাবার কথা। যায়ও। কিন্তু তোমার তাতে তৃপ্তি নেই! এই দুটো নেশাকে তো

তুমি ছাড়তে পারবে না।'

হঠাৎ কী যেন হয়ে গেল মুরলীর। যেমন হয়েছিল লালাবাবুর ঐ—'বেলা যায়' কথাটা শুনে! রানীর দুটি হাত নিজের মুঠোয় তুলে নিয়ে বললে, 'একটা সুযোগ আমাকে দাও, রানু! জাস্ট ওয়ান চান্স! আমি যে জীবনে কখনো কারও কাছে হারিনি!'

রানী একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল আট-বছরের চেনা তার নিজের অচেনা মানুষটার দিকে। নতুন করে তাকে চিনবার চেষ্টা করল। তারপর বলল, 'ঝোঁকের মাথায় এ-কথা বলছ না? রাত ভোর হলেই ভুলে যাবে না নিজের প্রতিজ্ঞা?'

'একটা সুযোগ আমাকে দিয়ে দেখ। জাস্ট ওয়ান চান্স। তোমার বাবার কাছে, অসীমার কাছে আমি ছোট হয়ে গেছি। আমি হেরে গেছি। মামণির কাছেও আমাকে ছোট করে দিও না, প্লীজ! দেবে একটা সুযোগ?'

'দেব। তবে কঠিন শর্তে! পারবে?'

'বল? কী শর্ত আরোপ করতে চাও তুমি?'

'কতগুলি মেয়ের সঙ্গে তোমার অবৈধ সম্পর্ক বর্তমানে আছে, আমি জানি না, জানতে চাইও না। আমি আশা করব, তুমি তোমার প্রতিজ্ঞা রাখবে। ওদের কাছ থেকে ক্রমশ নিজেকে গুটিয়ে আনবে। যাতে মামণি বড় হয়ে কোনদিন না কারও কাছে শোনে যে, তার বাপিটা ছিল একটা চরিত্রহীন, লম্পট! কিন্তু কালো টাকার মোহটা তোমাকে সাতদিনের মধ্যে ত্যাগ করতে হবে। জাস্ট এক সপ্তাহ—'

'তাই হবে। বল, কী প্রমাণ চাও তুমি?'

'আমার ধারণা সাত থেকে আট লাখ্ টাকা ব্ল্যাকমানি আছে তোমার। বিভিন্ন বেনামী ব্যাঙ্ক ভল্টে, বাথরুমের ফল্‌স্ সিলিঙের উপর.....।'

'না। পুরো দশ লাখ। এ-কথা কেন?'

'সাত দিনের মধ্যে দশ লাখ টাকা তোমাকে দান করতে হবে। বিভিন্ন জনহিতকর প্রতিষ্ঠানে। মাদার টেরেসার অনাথ আশ্রমে, রামকৃষ্ণ মিশনে, বাবা আমতের কুষ্ঠাশ্রমে, হেল্‌প-এজ-ইন্ডিয়া, ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ ইত্যাদি, ইত্যাদি। পারবে?'

'পারব।'

'আর তারপর তোমার মামণির মাথায় হাত রেখে তোমাকে প্রতিজ্ঞা করতে হবে : জীবনে আর কখনো ঘুষ নেবে না। পারবে?'

মুরলী দৃঢ়মুষ্টিতে রানীর হাতটা ধরে বলল, 'তাই হবে।'

রানী উঠে দাঁড়াল। মুরলী বললে, 'তাহলে এ ঘরে এস ?'

রানী ধীরে ধীরে ছাড়িয়ে নিল নিজের হাতটা। বললে, 'না ! আজ নয় ! আজ বুধবার, নেক্সট্ বুধবার। এই কদিন আমার কঠিন তপশ্চর্যা। সপ্তাহব্যাপী আমার ব্রত। এই সাতদিন আমি মাথায় তেল দেব না, স্বপাক একাহারী থাকব। তোমার সঙ্গে টেবিলে বসে খাব না। রাতে মামণির ঘরে মাদুর পেতে শোব। সাত-সাতটা দিন আমার কাটবে পূজাঘরে। আমি জপ করব, পুজো করব, ধ্যান করব। তুমি এই সাতদিন আমাকে স্পর্শ করবে না, প্লিজ। সংসারের সব দায়-দায়িত্ব আমার। তা নিয়ে চিন্তা কর না। তারপর তুমি যদি কথা রাখতে পার, তাহলে আগামী বুধবার আমাকে দেখিও কোথায় কত ডোনেশান দিয়েছ। ইচ্ছা হলে আগামী বুধবার আমাদের ডবলবেড পালঙ্কটা ফুল দিয়ে সাজিও, আট বছর আগে যেমন সাজিয়েছিলে। আমি আপত্তিও করব না, লজ্জাও পাব না। কিন্তু আজ নয়, প্লীজ।'

এম. ডি. প্যাটেল কোন কথা বলতে পারল না। অপরাধীর মতো মাথা নত করে দাঁড়িয়েই রইল।

আটপৌরে শাড়ির প্রান্তে বাঁধা চাবির গোছাটা পিঠে ফেলে রানী মামণির ঘরের দিকে এগিয়ে গেল। পার্টিশন দরজাটা পার হয়ে বললে, 'এবার ঘুমোতে যাও। তিনটে বেজে গেছে।'

দু-ঘরের মাঝখানে যে পার্টিশান দরজা, যার পাল্লা দুটো আজ তিন বছর ধরে পরস্পরের অঙ্গস্পর্শ করেনি—তা আজ প্রথম পরস্পরকে আলিঙ্গন করল। মুরলী বুঝতে পারে—ও-প্রান্তে কবাট রুদ্ধ হবার শব্দ হল। দ্বারের এ-প্রান্তে পড়ে রইল বিরহী রাজা, ও-প্রান্তে ব্রতচারিণী রানী।

মুরলী এসে বসল তার বিরাট পালঙ্কের একান্তে। বালিশটা টেনে নিয়ে আপন মনে বলল, তুমি ভুল বলেছিলে সার্জেন্ট-কবি। তুমি বলেছিলে, 'রানী কেউ হয় না, রানীকে আমরা বানাই।' কথাটা ঠিক নয় !

রানীকে কেউ বানায় না। অন্তর্নিহিত শক্তিতে কেউ কেউ রানী হয়ে যায়। তোমরা যার মাথায় মুকুট পরিয়ে খেলার শুরুতে রানী আখ্যা দিয়েছিলে সেই সর্বজনস্বীকৃতার কথা বলছি না। সে তো লড়াইয়ের ময়দানে কবে মরে পেতনী হয়ে গেছে—গজ-ঘোড়া-নৌকার ধাক্কায় ! আমি বলছি, বাসিফুলের মালার ঐ আট-দুকুনে ষোলটা ছোট ছোট কুঁড়ির কথা। কেউ কালো, কেউ ধলো। ওদের কেউ ভ্রূক্ষেপই করে না। ওরা শরৎবাবুর 'সাধারণ মেয়ে'। নজর যদি থাকে তবে দেখতে পাবে কৈশোর অতিক্রমণ-মুহূর্তে—যেদিন ও প্রথম নারীত্ব লাভ

করল—সেদিন ঘর ছেড়ে ও একলাফে দু পাও যেতে পারে, যে ক্ষমতা নেই স্বয়ং রাজার ! কিন্তু তার পরেই ওরা দেখতে পায় সংসারের শাদা-কালো চৌখুপি কাটা ঘরে ঝাঁকে ঝাঁকে ঘুরে বেড়াচ্ছে রক্তলোভী হাঙরের দল ! হাঙরের দল ফন্দি আঁটে। ওদের ভূতলশায়ী করতে চায়। বৈধ বিবাহই হোক অথবা অবৈধ বলাৎকার। অধিকাংশ কুঁড়িই ফুল হয়ে ফুটবার সুযোগ পায় না। বেমক্কা মারা পড়ে। কেউ কেউ খেলা শেষে মাঝপথে থুবড়ি হয়ে নিশ্চল দাঁড়িয়ে থাকে।

কিন্তু সেই বিশেষ মেয়েটি—আটজনের মধ্যে যে 'অষ্টম' ? শরৎবাবুর সেই সাধারণ মেয়েটি ? সে হাঙবেব মাঝ দিয়ে গুটিগুটি এগিয়ে যায়। সপ্তপদ অতিক্রমণের প্রতিজ্ঞা তার। না, কারও হাত ধরে নয়। অন্তর্নিহিত আদ্যাশক্তির আশীর্বাদে সে স্বয়ংসিদ্ধা ! সে এসে উপনীত হয় তার বাঞ্ছিত শেষ তীর্থের চূড়ায়। মুহূর্তমধ্যে—যেন মন্ত্রবলে, সে রানী হয়ে যায়। জন্মসূত্রে সে 'বড়ে'—নিতান্তই pawn ! কিন্তু অপর্ণার মতো, মহাশ্বেতার মতো কঠিন তপস্যা করে আপন মাহাত্ম্যে সে—'রানী' !

কিন্তু কেন রানী হবার এই অতন্দ্র সাধনা ঐ সামান্যা নারীর ?

না, পটের বিবিটি সাজতে নয়, রানী-মহলে সাতদাসীর সেবা নিতে, ভোগবিলাসের প্লাবনে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হতেও নয়, তার একমাত্র প্রতিজ্ঞা : তার রাজাকে সে কিছুতেই মাৎ হতে দেবে না। রক্ষা করবে বুক দিয়ে আগলে !

তাই সে রানী হয়ে যায় !

লৌকিক না অলৌকিক ?

কয়েক বছর আগেকার কথা। সেবার বিশেষ আমন্ত্রণে ভাগলপুর যেতে হয়েছিল একটা সাহিত্যসভায় যোগ দিতে। সভায় প্রত্যাশিতভাবেই আমাকে একটি বক্তৃতা দিতে হল। শরৎচন্দ্র থেকে বনফুল—ভাগলপুরের সাহিত্যসভায় সব কিছুই প্রাসঙ্গিক। দীর্ঘ সময় বক্তৃতা দিয়ে মঞ্চ থেকে নেমে এলাম। অভ্যর্থনা সমিতির অন্যতম কর্ণধার ডক্টর বিনয় মাহাতো এগিয়ে এসে বলল, আপনি আবার তাড়াহুড়ো করে মঞ্চ থেকে নেমে এলেন কেন, দাদা ? ওখানেই বসুন !

আমি বলি, একটু অপেক্ষা কর, আমি আসছি—

—টয়লেটে যাবেন ?

আমি আবার বলি, না রে বাবা। এত ব্যস্ত হচ্ছ কেন ? আমি পালিয়ে যাচ্ছি না—এখনি আসব। একটু অপেক্ষা কর....

শেষের দিকে আমার কণ্ঠস্বরে বোধহয় একটু ধমকের সুর এসে গিয়েছিল। আসলে সেটা উত্তেজনায়। ডক্টর মাহাতো সেটা বুঝতে পারল না। একটু বোধহয় আহত হল। অনেকেই ঐ সময় আমার সঙ্গে কথা বলতে চান। সম্ভবত আমার বক্তৃতার বিষয়ে। কিন্তু আমি ভ্রূক্ষেপ করি না। দশম সারির শেষপ্রান্তে-বসা সেই বিশেষ শ্রোতাটির দিকে এগিয়ে যাই। যাকে মঞ্চ থেকে বারে বারে লক্ষ্য করছিলাম, আর চোখাচোখি হতেই যে মিটিমিটি হাসছিল। সত্যি কথা বলতে কি, সেই বিশেষ শ্রোতাটির জন্য আমি বেশ বাগিয়ে বক্তৃতাটা দিতে পারিনি। উল্টোপাল্টা চিন্তায় আর স্মৃতিতে আমার বক্তব্য তথা ভাষা মাঝেমাঝে কেমন যেন এলোমেলো হয়ে যাচ্ছিল। চিনতে আমার ভুল হয়নি—যদিও সময়ের

ব্যবধানটা প্রায় চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর। আমারই বয়সী। উর্ধ্বাঙ্গে গেরুয়া রঙের একটা পাঞ্জাবি, তার উপর জহর-কোট। মাথায় ব্যাকব্রাশ বিরল কেশের রূপালী আভাস, চোখে একটা মোটা চশমা। হাতে চুরুট, তাতে আগুন দেওয়া নেই কিন্তু।

ভিড় ঠেলে দশম সারির কাছাকাছি এসে দেখি সেই চিহ্নিত আসনটা ফাঁকা। শ্রোতা কখন উঠে গেছে। এদিক ওদিক তাকাতেই নজরে পড়ল গেটের বাইরে রাস্তায় দাঁড়িয়ে চুরুট ধরাচ্ছে। আমি পিছন থেকে ডাকলুম : কমল ?

ভদ্রলোক ঘুরে দাঁড়ালেন। সেই মিটিমিটি হাসির আভাসমাত্র নেই। একটু যেন বিস্মিত। বললেন, আমাকে ডাকছেন ?

কী বলব বুঝে উঠ্‌তে পারছি না। কমল নয় তাহলে ?

ভদ্রলোক বললেন, আসুন। চুরুট চলবে তো ?

মাথা নেড়ে বলি, না, ধন্যবাদ !

—সে কী ? চুরুট খান না ? সিগ্রেট তো খেতেন এতকাল ?

পিছন ফিরে চলতে শুরু করেছিলাম। থমকে থেকে বলি, কী করে জানলেন ?

আবার সেই মিটমিটি হাসি। ভদ্রলোক বললেন, আমার কিছু অলৌকিক ক্ষমতা আছে। লোক দেখলেই তার অতীতের কথা বলে দিতে পারি।

বিরক্তি প্রকাশ হয়ে পড়ে জবাব দেবার সময় : বাঙ্কাম ! হয়তো আত্মকথামূলক কোন রচনায় সিগ্রেট খাওয়ার কথা লিখেছি, আপনি তা পড়েছেন, আর আজ....

ভদ্রলোক ঝুঁকে পড়ে বলেন, আপনার লেখা আপনার নিজের মনে থাকা উচিত। বলুন, কোন্ বইতে লিখেছেন—জীবনে প্রথম সিগ্রেট টেনেছিলেন কলেজ-স্কোয়ারে, বিদ্যাসাগর-মূর্তির ঠিক পিছন দিকে বসে। সঙ্গে ছিল আরও দুজন ইয়ার দোস্ত। তাদের মধ্যে একজন আচম্‌কা বলেছিল, অ্যাই ! এখানে সিগ্রেট টানাটা ঠিক হচ্ছে না। বিদ্যাসাগর মশাই যদি হঠাৎ পিছন ফিরে দেখেন ? আপনি হাসতে গিয়ে কাশির ধমকে বে-এক্তিয়ার ! বলুন, একথা কোথাও লিখেছেন ?

আমি খপ্ করে ওর হাতটা চেপে ধরে বলি, তুই কমল ! ঠিকই চিনেছি—তুই 'আপনি-আজ্ঞে' করে গুলিয়ে দিচ্ছিলি।

ও বললে, আয় বাপ্ ! কলকাতা থেকে আমদানি করা সাহিত্যিক। সভার মাননীয় সভাপতি—চেনার আগেই 'তুই-তোকারি' করতে পারি ?

—তুই তো ঢাকায় ছিলি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। ভাগলপুরে এলি কী করে?

—কিছুটা প্লেনে, কিছুটা ট্রেনে। হোটেল থেকে এ সাহিত্যসভায় সাইকেল রিক্‌শায়। সোজা হিসাব।

ধমকে উঠি, ন্যাকামি করিস্ না। ভাগলপুর এসেছিস্ কী উপলক্ষে?

—তোর মনে নেই? নিতার বাপের বাড়ি ছিল ভাগলপুরে?

নিতা—দীপান্বিতা ওর স্ত্রী। কমলের অসাম্প্রদায়িক বিয়েতে আমারও কিছু হাত-যশ ছিল। মনে পড়ে গেল সব কথা। হ্যাঁ, দীপান্বিতা ভাগলপুরের মেয়েই ছিল বটে।

ইতিমধ্যে কর্মকর্তাদের চার-পাঁচজন আমাদের ঘিরে ফেলেছেন। অনুষ্ঠানসূচির পরবর্তী আইটেমটি নাকি থমকে থেমে আছে সভাপতি-মশাই বেমক্কা হাওয়া হয়ে যাওয়ায়।

কমল বললে, ঠিক আছে, তুই যা। বক্তিমে-টক্তিমে মিটে গেলে দেখা হবে। তখন কথা হবে।

—কিন্তু তোর পাত্তা পাব কোথায়?

—আমি উঠেছি হোটেল 'মমতাজ'-এ। আমিই তোকে খুঁজে নেব। বিকালটা ফ্রি রাখিস্।

বাধ্য হয়ে ফিরে এলাম সভামঞ্চে।

পরবর্তী বক্তা ততক্ষণে বোধহয় আধুনিক কবিতা অথবা কথাসাহিত্য নিয়ে আলোচনা করছিলেন। একটি বর্ণ শুনিনি। মানে শব্দগুলি কানে ঢুকছে ঠিকই, অর্থগ্রহণ হয়নি। আমার মনে তখন নানান চিন্তা...অতীতের স্মৃতিচারণ...কলেজ জীবনের কথা...স্কুলেব কথা....

কমল যদি তার শ্বশুরবাড়িতেই এসে থাকে তাহলে হোটেল মমতাজে উঠবে কেন? চল্লিশ বছর আগে যে মতপার্থক্যটা ছিল, সেটাকে কি আজও জিইয়ে রাখা হয়েছে? তাই যদি হবে তবে বাঙলাদেশ থেকে ও হতভাগা এলই বা কিসের টানে? একা এসেছে, না সস্ত্রীক?

কমল আমার স্কুলের সহপাঠী। কলকাতায় কলেজস্ট্রিট পাড়ায় আমরা একই ক্লাসে, একই সেকশানে পড়তাম। কমল ওর নাম নয়। পিতৃদত্ত নাম 'কামালুদ্দীন চৌধুরী'। ধর্মে মুসলমান। ক্লাসে ছিল তেত্রিশজন হিন্দু আর সাতজন মুসলমান ছাত্র। কামালুদ্দীন এক আজব ব্যতিক্রম। বাকি ছয়জনই 'ভার্নাকুলার' হিসাবে নিয়েছিল 'উর্দু' আর দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে 'পার্শিয়ান।' দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ

কামালুদ্দীন নিল আমাদের সঙ্গে বাঙলা আর দ্বিতীয় ভাষা সংস্কৃত। সেদিনই ওর নাম থেকে ঐ 'উদ্দীন' অংশটা খোয়া যায়। ওর নাম হয়ে গেল 'কামাল'! তখনোও সে কমল হয়নি। হয়ে গেল কামাল চৌধুরী।

তারপর বিশেষ পারিবারিক কারণে আমি কলকাতা ছেড়ে আসানসোলে চলে যাই। আসানসোল ই. আই. আর. স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিই উনিশ-শ' চল্লিশে। পরে ভর্তি হই সেন্ট জেভিয়ার্সে আই. এস্‌সি. ক্লাসে। সেখানেও কামাল হাজির। তবে সে আর্টস্ স্টুডেন্ট।

আমাদের সরস্বতী পূজায় কামাল এসে মণ্ডপ সাজাতো। ঢাকির হাত থেকে ঢাকটা কেড়ে নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঢাক বাজাতো! মহরমের তাজিয়া নিয়ে যখন বার হত তখন ঢাকের বদলে ও বাজাতো তাশা। আমরা—ওর হেঁদু-দোস্ত-এর দল, ভিড়ের মধ্যে মিশে গিয়ে হাসান-হোসেনের মৃত্যুতে বুক চাপড়ে শোক প্রকাশও করেছি।

গোল বাধল কামাল যখন প্রেমে পড়ল। পাড়াতুতো একটি হিন্দু ব্রাহ্মণের মেয়ের সঙ্গে। একা কামাল পড়লে হয়তো আমরা তাকে টেনে তুলতাম, কিন্তু নিউটনের তৃতীয় সূত্র অনুসারে দীপান্বিতাও পড়ল ঘাড় গুঁজড়ে। দু বাড়িতেই প্রবল আপত্তি। সেটা প্রাক-স্বাধীনতা যুগের কথা। বৃহত্তর বঙ্গে তখন লীগ মন্ত্রিত্ব।

কামাল দীপান্বিতাকে নিয়ে ইলোপ করল।

দীপান্বিতার বাবা থানায় গেলেন, ডায়েরি করতে। নারীহরণের মামলা। থানা এফ. আই. আর. নিলই না। দারোগা বললেন, আপনার কন্যাটি হিসাব মতো প্রাপ্তবয়স্কা। সে স্বয়ম্বরা হয়েছে। বাড়ি যান, আত্মীয়-স্বজনকে মিষ্টিমুখ করান গে। বিনা 'পণে' একটি মেয়ে তো দিব্যি পার করলেন মশাই, কেন হাঙ্গামা-হুজ্জোৎ করছেন?

সেদিন থেকে কামাল হয়ে গেল 'কমল'।

মাহাতো আমার আস্তিন ধরে টানায় স্মৃতিচারণ বন্ধ হল। ডক্টর মাহাতো বলল, আপনি সভাপতি। আপনিই তো ঘোষণা করবেন। নেক্সট আইটেম : রবীন্দ্র-সঙ্গীত গাইবে শ্রীমতী.....

প্রথম অধিবেশন ভাঙল বেলা বারোটায়। বারোটা থেকে দুটো—দু ঘণ্টার মধ্যাহ্ন-বিরতি। সভামণ্ডপটা যে স্কুলের প্রাঙ্গণে সেই স্কুলের ক্লাসঘরে মধ্যাহ্ন-ভোজনের সাড়ম্বর আয়োজন। হাইবেঞ্চিতে কলাপাতা, মাটির খুরি। সদস্যরা, যাঁরা কুপন নিয়েছেন, তাঁরা পাশাপাশি বসে যাচ্ছেন। যাঁদের বাড়ি কাছে-পিঠে

তাঁরা এই দু ঘণ্টার মধ্যে পিত্তিরক্ষা করতে ছুটলেন—তাঁরা কুপন আদৌ কেনেন-নি। স্থানীয় সদস্যরা, বরং বলা উচিত তাঁদের বেটার-হাফের দল, আঁচল সামলে পরিবেশন করতে এলেন।

এদিক-ওদিক অনেক খুঁজলাম—কমলের দেখা পেলাম না। ও বোধহয় হোটেলে ফিরে গেছে। অতএব পংক্তি-ভোজনে বসা গেল। আহারান্তে ডক্টর মাহাতোকে বললাম, হ্যাঁ ভাই, হোটেল 'মমতাজ'টা কতদূর ?

—প্রায় মাইলখানেক। কেন ?

—ওখানে আমার এক বন্ধু উঠেছে। ফোন করা যাবে ?

—কেন যাবে না ? আসুন আমার সঙ্গে। ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

স্কুলবাড়ির—মানে যেখানে সাহিত্য-সভাটা হচ্ছে—পাশেই একটি ডাক্তারখানা। টেলিফোন ছিল সেখানে। যোগাযোগ হল। কমল ঘরেই ছিল। মধ্যাহ্ন আহার সমাপ্ত হয়েছে তার। বললে, ক্লাস কাটতে পারবি ? সহসভাপতিকে বিকালের সেশনটায় 'প্রক্সি' দিতে বলে ?

টেলিফোনের কথা মুখে হাত চাপা দিয়ে মাহাতোকে বলি, কমল আমার স্কুলের বন্ধু—পঞ্চাশ বছর পরে দেখা হল। বিকেল বেলার অধিবেশনটায় যদি আমি অনুপস্থিত থাকি—

বিনয় মাহাতো পণ্ডিত ব্যক্তি। বুঝমানও। আমার অনুজপ্রতিম। এককথায় সমঝে নিল। বলল, ঠিক আছে দাদা, কিন্তু সন্ধ্যায় স্থানীয় ছেলেমেয়েরা গান গাইবে, আবৃত্তি করবে, ছোট মেয়েরা নাচবে। তাহাড়া প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণীও আছে, সেটা আপনাকে দিতে হবে। তাই সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টার মধ্যে চলে এলেই হবে। আপনার বন্ধুকেও নিয়ে আসবেন।

মাহাতোকে বলি, বন্ধুর কী প্রোগ্রাম আছে জানি না—তবে আমি সাড়ে ছয়টার আগে নিশ্চিত ফিরে আসব।

টেলিফোনে কমলকেও সেইমতো জানিয়ে দিলাম। ডক্টর মাহাতো একজন পরিচিত রিক্‌শাওয়ালাকে নির্দেশ দিল আমাকে হোটেল 'মমতাজ'-এ নিয়ে যেতে। আর এ-কথাও পই-পই করে বুঝিয়ে দিল, ঠিক সন্ধ্যা ছয়টায় যেন সে আবার সেই হোটেলে গিয়ে হানা দেয়। আসামীকে পাকড়াও করে নিয়ে আসে। রিকশাওয়ালার হাতে একটা অগ্রিম নোটও গুঁজে দিল দেখলাম।

কমল বললে, তুই অলৌকিকতায় বিশ্বাস করিস না, নারে নরেন ?

—প্রশ্নটা এমন 'নেগেটিভ'-ধর্মী হল কেন আগে তাই বোঝা। তুই যেন ধরেই নিয়েছিস যে, আমি অলৌকিকতায় বিশ্বাস করি না।

—তাই ধরে নিয়েছি। প্রথম কথা : তোর 'পয়োমুখম্' বইটা পড়ে সেটাই পাঠকের ধারণা হয়! দ্বিতীয় কথা : সকালে যখন বললাম, আমার কিছু অলৌকিক ক্ষমতা আছে, তুই একেবারে প্রতিবর্তী-প্রেরণায় তৎক্ষণাৎ ধমকে উঠ্‌লি : 'বাঙ্কাম!'

কথা হচ্ছিল হোটেল মমতাজে, কমলের ঘরে। ও আধশোয়া হয়ে চুরুট ধরিয়ে বসেছে খাটে, আমি একটা সোফায় ভুঁড়ির খাঁজে একটা বালিশ টেনে নিয়ে। আমি বললাম, 'অলৌকিকত্ব' নিয়ে যারা ব্যবসা করে—বিশ্বাসী-মানুষের মস্তকে পনস বিদীর্ণ করে কাঁঠাল খায়, তাদের বিরুদ্ধে আমি একপায়ে-খাড়া। তাবিজ, কবজ, রত্নধারণ, হাত দেখা, কোষ্ঠিবিচার, শান্তি-স্বস্ত্যয়ন, কিরো'জ-নাম্বার, সব, স—ব কিছুর বিরুদ্ধেই আমার সোচ্চার প্রতিবাদ। সবই বাঙ্কাম! কিন্তু তাই বলে 'অলৌকিকতা'-য় বিশ্বাস করব না কেন ?

—তাহলে তোর মতে 'অলৌকিক' কী ? তার অর্থ কী ?

—অভিধানে যে অর্থ নির্দেশ করা আছে তাই। চলন্তিকার মতে 'অলৌকিক' মানে 'লোকাতীত, যাহা মর্ত্যে দুর্লভ। যাহা ইহলোকের নহে।' লোকাতীত কথাটা ধোঁয়াটে ; মর্ত্যে দুর্লভ তো অনেক কিছুই। ক্র্যাকাটোয়ার উদ্‌গীরণ থেকে শ্যাম দেশের যমজভাই—যাদের পিঠে-পিঠে জোড়া ছিল, এই সব কিছুই তো অত্যন্ত দুর্লভ। ইহলোক মানে কী ?—মানুষের জ্ঞানের সীমানার বাইরে ? যা পঞ্চেন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয় ? সেক্ষেত্রে ইলেকট্রন থেকে কোয়াসার সব কিছুই তো অলৌকিক!

কমল ধমকে ওঠে, না, নরেন। তুই অহেতুক সহজ জিনিসটাকে গুলিয়ে দিচ্ছিস। 'ইহলোক' মানে 'মেটিরিয়াল ওয়ার্ল্ড'। জুরাসিক যুগে মানুষ ছিল না, কিন্তু 'ইহলোক' ছিল। 'অলৌকিক' মানে বিজ্ঞান যার সঠিক ব্যাখ্যা দিতে পারছে না। ইলেকট্রন বা কোয়াসার পঞ্চেন্দ্রিয়গ্রাহ্য না হলেও বুদ্ধিগ্রাহ্য। বিজ্ঞান তার হদিস্ জেনেছে। ব্যাখ্যা করতে পারছে।

—তাহলে মাধ্যাকর্ষণ ?

—কী মাধ্যাকর্ষণ ?

—গ্র্যাভিটেশন! কেন সূর্য পৃথিবীকে টানছে! অতি দূরস্থিত প্লুটোকে টানছে ? কী দিয়ে টানছে ? কেন টানছে ? বিজ্ঞান জানে না। নিউটন মাধ্যাকর্ষণের

ব্যবহারিক সূত্রটুকুই শুধু আবিষ্কার করেছিলেন, তার উৎসের সন্ধান পাননি। মাধ্যাকর্ষণ নিশ্চয়ই 'লোকাতীত'। বিজ্ঞান যার ব্যাখ্যা জানে না। ফলে সূর্য যে পৃথিবীকে মহাকাশে ছুটে যেতে দিচ্ছে না, এটা অভিধান মতে একটা 'অলৌকিক' ঘটনা। এর কোন লৌকিক ব্যাখ্যা নেই! কিন্তু হঠাৎ এ প্রসঙ্গ তুললি কেন, কমল? আমরা পঞ্চাশ বছর পরে কি মিলিত হয়েছি 'বেল্‌স্‌ থিয়োরেম্‌' নিয়ে আলোচনা করতে?

ও বললে, বলছি। কিন্তু তার আগে সংক্ষেপে বল দেখি: 'বেল্‌স্‌ থিওরেম'টা কী?

—তুই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনের অধ্যাপনা করতিস্‌ না?

—না, বাঙলার। হঠাৎ সে কথা কেন?

—'বেল্‌স্‌ থিয়োরেম'টার জন্ম পদার্থ-বিজ্ঞানে। কিন্তু সেটা এখন দর্শনের এক্তিয়ারে। গ্যারী জুকভ বলছেন, "Bell's theorem is a mathematical proof. What it proves is that if the statistical predictions of quantum theory are correct, then some of our commonsense ideas about the world are profoundly mistaken....This is quite a conclusion, because the statistical predictions of quantum mechanics are always correct." ['বেল'-এর (অধ্যাপক J. S. Bell) থিয়োরেম (1964) বিশুদ্ধ অঙ্কের হিসাবে প্রমাণিত। এই থিয়োরেম প্রমাণ করেছে যে, কোয়ান্টাম থিয়োরির পরিসাংখ্যিক পূর্বাভাস যদি সত্য হয়, তাহলে এই প্রপঞ্চময় দুনিয়া সম্বন্ধে আমাদের যে সাধারণ ধারণা তার অনেকটাই প্রভূতভাবে ভ্রান্ত....এটা একটা প্রতিষ্ঠিত সিদ্ধান্ত হয়ে যাচ্ছে, কারণ কোয়ান্টাম মেকানিক্সের পরিসাংখ্যিক পূর্বাভাসগুলি অভ্রান্ত সত্য।]

কমল খুব মন দিয়ে শুনল। তারপর বলল, শাদামাটা ভাষায় বেল-সাহেবের থিয়োরেমটা আমাকে বুঝিয়ে দিতে পারিস, নরেন? তোর 'নক্ষত্রলোকের দেবতাত্মা' পড়ে আইনস্টাইনের 'ফোর্থ ডাইমেনশনট'টার ব্যাপার-স্যাপার কিছুটা বুঝতে পেরেছিলাম। যদিও আমি বিজ্ঞানের অ-আ-ক-খও জানি না।

আমি বললাম, ঠিক আছে, শোন বলি: ধর তুই আর আমি একটা বিরাট মাঠের মাঝখানে পিঠোপিঠি দাঁড়ালাম। আমরা দুজনে স্থির করেছি যে, তুই যদি ডান হাত ঘোরাতে থাকিস তাহলে আমি বাঁ-হাত ঘোরাবো। ঠিক যে-মুহূর্তে তুই হাত বদল করে বাঁ-হাত ঘোরাতে শুরু করবি সেই মুহূর্তেই আমিও বাঁ-

হাত বদলে ডান-হাত ঘোরাতে শুরু করব। কেমন তো ? এখন আমরা পিঠো-পিঠে দাঁড়িয়ে ছিলাম—তুই পুব দিকে চল্‌তে শুরু করলি ডান-হাত ঘোরাতে ঘোরাতে, আমি তার উল্টো দিকে পশ্চিমমুখো চলেছি, বাঁ-হাত ঘোরাতে ঘোরাতে। কেউ কাউকে দেখতে পাচ্ছি না। হঠাৎ তুই চিৎকার করে উঠ্‌লি 'হাত বদলালাম।' সঙ্গে সঙ্গে পিছন-ফেরা আমিও বাঁ-হাত বদলে ডান হাত ঘোরাতে শুরু করলাম। এখন বল, এটা কি সম্ভব ? একই মুহূর্তে দুজনের হাত বদলানো ?

—হ্যাঁ, খুবই সম্ভব। কেন নয় ?

—না, সম্ভব নয়। তোর চিৎকার শব্দ-তরঙ্গের মাধ্যমে আমার কানে পৌঁছাতে কিছুটা সময় নেবেই। শব্দ-তরঙ্গের গতিবেগ ঘণ্টায় প্রায় সাতশ মাইল। ফলে সামান্য কিছুটা সময়ের পার্থক্য অনিবার্য। যে যা হোক, এখন ধর যদি তুই পুবমুখো চলতে চলতে চীনের শেষপ্রান্তে পৌঁছে যাস আর আমি পৃথিবীর বিপরীত প্রান্তে—একশ আশি ডিগ্রি ফারাকে পৌঁছে যাই, তাহলে ? তুই আমাকে কী করে খবর দিবি ? ঠিক কখন হাত বদলালি ?

কমল বলল, কেন ? এস. টি. ডি. টেলিফোনে !

—কারেক্ট ! টেলিফোনের শব্দতরঙ্গ আসলে বিদ্যুৎতরঙ্গ। ইলেকট্রো-ম্যাগনেটিভ ওয়েভ। তার গতিবেগ আলোর গতির সঙ্গে সমান। সেকেন্ডে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল। ফলে এবারও তোর নির্দেশ পেতে (ধরে নিচ্ছি টেলিফোন কানেকশান পেতে কোন সময়ই লাগেনি) আমার সামান্য কিছুটা দেরি হবে। হবে তো ?

কমল বলল, অঙ্কের হিসাবে হবে। বাস্তবে হবে না। কারণ আলোক-তরঙ্গ বা বেতার-তরঙ্গ এত দ্রুতবেগে যায় যে, প্রতি সেকেন্ডে সে পৃথিবীর নিরক্ষরেখা বরাবর প্রায় সাড়ে সাতবার পাক মারতে পারে।

আমি বললাম, ঠিক কথা। তাহলে তোর নির্দেশটা পেতে আমার দেরী হবে এক সেকেন্ডের অন্তত চৌদ্দভাগের একভাগ। অঙ্কের হিসাবে। মানছিস্ তো ?

কমল স্বীকার করল, না মানার কী আছে ?

—এবার শোন, 1964 খৃষ্টাব্দে সুইটজারল্যান্ডে বসে 'বেল' যে আবিষ্কারটা করলেন তার কথা। উনি দুটি উপপরমাণু কণিকা (sub-atomic particles) নিয়ে গবেষণা করছিলেন ! 'উপপরমাণু' জিনিসটা কী তোকে বোঝানো মুশকিল। 'অ্যাটম' বা 'পরমাণু'-কে তুই চিনিস। এককালে তা অবিভাজ্য বলে মনে করা

হত। ক্রমে তারও নানারকম অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের হদিস বিজ্ঞান আবিষ্কার করল—ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রন, পজিট্রন প্রভৃতি। ধরা যাক, তেমনি দুটি ইলেকট্রন নিয়ে উনি পরীক্ষা করছিলেন, যার একটি ঘড়ির গতিপথে (clockwise) পাক, খায়, একটি বিপরীতমুখে পাক খায় (anti-clockwise)। যেন বামাবর্ত্ম আর দক্ষিণাবর্ত্ম শঙ্খের পাক খাওয়ার ছন্দ। আর তারা প্রতিজ্ঞা করেছে একজন যে-দিকে পাক খাবে অন্যজন ঠিক তার উল্টোমুখে পাক খাবে। এ যে মুহূর্তে মুখ ঘোরাবে, ও ঠিক সেই মুহূর্তেই মুখ ঘোরাবে। যেমন তুই-আমি চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলাম। বেল-সাহেব তাঁর পরীক্ষায় প্রমাণ করলেন যে, যখন ওদের দূরত্ব এত বেশি যে, আলোক বা বেতার তরঙ্গ একটি উপপরমাণু থেকে অপরটিতে পৌঁছাতে তিন-চার-পাঁচ সেকেন্ড সময় নেয়, তখনো তারা হুবহু একই খণ্ডমুহূর্তে একে অপরের বিপরীত ঘূর্ণন-ছন্দে নিজেকে বদলে নিতে পারছে! প্রশ্ন হচ্ছে : কেমন করে? আইনস্টাইনের নিদান অনুযায়ী আলো বা বেতার তরঙ্গের অর্থাৎ ইলেকট্রোম্যাগনেটিক তরঙ্গের চেয়ে অধিকতর গতিতে ইহলোকে কোন কিছুই যেতে পারে না। তাহলে ঐ উপপরমাণু দুটি—যাদের দূরত্ব দশ লাইট-সেকেন্ড (অর্থাৎ বেতার তরঙ্গ যে দূরত্ব পাড়ি দিতে দশ-সেকেন্ড সময় নেয় = 10 × 1,86,000 মাইল = প্রায় সাড়ে আঠারো লক্ষ মাইল) তাঁরা কেমন করে একে-অন্যের ঘূর্ণনছন্দ দশ-সেকেন্ড পরে নয়, ঠিক একই খণ্ডমুহূর্তে পরিবর্তন করছে?

কমল জানতে চাইল, এর উত্তরটা কী?

--বিজ্ঞান জানে না। বেল-সাহেবের ঐ পরীক্ষা তিন দশকের পুরানো। এই ত্রিশ বছরে অনেকে অনেক মত প্রকাশ করেছেন। কারও মতে বিশ্বপ্রপঞ্চের প্রতিটি পরমাণু, প্রতিটি বস্তু একই সূত্রে গ্রথিত। কী আশ্চর্যের কথা, কমল—ঠিক এই কথাটাই পৌরাণিক যুগে নাকি বলেছিলেন ব্রহ্মর্ষি যাজ্ঞবল্ক, মহাপণ্ডিতা গার্গীর প্রশ্নের জবাবে। মহারাজ জনকের সভায় শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মর্ষি কোনজন তা নির্ধারণ করতে গার্গী যাজ্ঞবল্ককে প্রশ্ন করেছিলেন, 'এই যে ভূলোক, দ্যুলোক এবং পাতালরাজ্য এরা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে না কেন? কোন শক্তি এদের ধরে রেখেছে?' যাজ্ঞবল্ক বলেছিলেন, "বিশ্বপ্রপঞ্চের সব কিছুই একটি মাত্র সূত্রাত্মায় গ্রথিত। তিনিই হচ্ছেন : ব্রহ্ম। কিন্তু হে গার্গী! এটাই আপনার শেষ প্রশ্ন হউক। এর পর অতিপ্রশ্ন করলে, আপনার মস্তক পাতন হবে!"

কমল বললে, এ কাহিনীটা শুনেছি। কিন্তু এ তো একদলের মত। দ্বিতীয় দল বৈজ্ঞানিকেরা কী ব্যাখ্যা দিতে চাইছেন?

আমি বলি, দ্বিতীয় দল নোবেল-লরিয়েট বিজ্ঞানী এবং দার্শনিকদের ধারণা—যা এই বিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে তাঁরা দুনিয়াকে জানাচ্ছেন : তার সঙ্গে অদ্বৈত বেদান্তের মূল সূত্রের খুব একটা পার্থক্য নেই—তা যেন আদি শঙ্করাচার্য অথবা বিবেকানন্দের বক্তব্যের খুব কাছাকাছি! বিশ্বের সেরা নবীন ফিজিসিস্টরা বলছেন, হয়তো এই বিশ্বপ্রপঞ্চের প্রতিটি অণু-পরমাণু, উপপরমাণু একই চৈতন্যময় সত্তার খণ্ডাংশমাত্র! একজন বৈজ্ঞানিক প্রমাণ করলেন : আলোক তরঙ্গভঙ্গ মাত্র। তার কোনও বাস্তব অস্তিত্ব নেই। নিশ্ছিদ্র প্রমাণ! মানতেই হচ্ছে! অপরজন প্রমাণ করলেন, না, আলোক ফোটনের সমাহারমাত্র, যে ফোটনের অস্তিত্ব আছে। ভর আছে। তা মাপা যায়। সেটাও নিশ্ছিদ্র প্রমাণ! কারও মতকে খণ্ডন করা যাচ্ছে না। অথচ আমরা জানি, দুটোই সত্য হতে পারে না। এর উপর প্রফেসর আইনস্টাইন প্রমাণ করলেন যে, আলোক ফোটন যখন একটি বিশেষ ছন্দে দ্বিছিদ্র-বিশিষ্ট পথে চলে তখন তার ব্যবহার এমন বিচিত্র যে, দুটি অভ্যুপগমের (হাইপথেসিস) অন্তত একটিকে মেনে নিতেই হবে। এক : ফোটনের চৈতন্য আছে। দুই : ফোটন কেমন করে এমন ব্যবহার করছে তার হেতু বিজ্ঞান জানে না! তা অলৌকিক!

কমল বলল, শুনেছি শ্রীলঙ্কার ডক্টর কভুরের পথরেখা ধরে কলকাতাতেও একটা যুক্তিবাদী আন্দোলন গড়ে উঠছে?

আমি বলি, উঠছিল! প্রাথমিক পর্যায়ে তারা খুবই ভাল কাজ করছিল। গ্রামে গঞ্জে সংস্কারাচ্ছন্ন সাধারণ মানুষের অন্ধ বিশ্বাস, কুসংস্কার, ঝাড়-ফুঁক মন্ত্রতন্ত্রের বিরুদ্ধে যুক্তিবাদকে প্রতিষ্ঠিত করছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সে আন্দোলনও এখন গুরুবাদী পথে চলতে শুরু করেছে। সাধারণ কর্মীরা আর তাদের নিজেদের বিবেক বা অধুনাতন বিজ্ঞানের নির্দেশে পথ চলতে ভুলে গেছে—গুরুদেবের শ্রীমুখ-নিঃসৃত বাণীতেই তারা অন্ধ বিশ্বাস স্থাপন করতে শুরু করেছে। কিন্তু সে সব কথা থাক। তুই আসল কথাটা বারে বারে এড়িয়ে যাচ্ছিস। হঠাৎ এ প্রসঙ্গ তুল্‌লি কেন, তাই বল?

—কারণ এবার ভাগলপুরে এসে এমন একটা ঘটনার সম্মুখীন হয়েছি, বুদ্ধিতে যার কোনও ব্যাখ্যা খুঁজে পাচ্ছি না। মানে লৌকিক ব্যাখ্যা। না আমি, না নিতা।

—বেশ তো, বল, শুনি তোর অভিজ্ঞতা, ভাল কথা। নিতা, আই মীন দীপান্বিতা, কোথায়?

—বলছি, সব কথাই খুলে বলছি। শোন। শুনে তোর ব্যাখ্যা দে—এটা লৌকিক না অলৌকিক।

আমাদের যৌবনকালে দীপান্বিতা ছিল পাড়ার সবচেয়ে সুন্দরী মেয়ে। বাপ-মায়ের একমাত্র সন্তান। হয়তো সেজন্যই কামালকে ওঁরা ক্ষমা করতে পারেননি। দীপান্বিতার মুখের উপর বাপের বাড়ির দরজাটা বন্ধ হয়ে গেছিল। সে আজ প্রায় পঞ্চাশ বছর আগেকার কথা—উনিশশ পঁয়তাল্লিশ সাল। তারপরেই আমাদের যৌবনকালে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে ঘটে গেল পরপর কিছু ক্রান্তিকারী ঘটনা—'ডাইরেক্ট অ্যাকশন'—'লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান'—দাঙ্গা-স্বাধীনতা এবং বঙ্গ-বিভাগ। কে কোথায় ছিটকে পড়লাম আমরা! অনেকদিন পরে খবর পাই, কামাল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই এম. এ. পাস করেছিল—আমার ধারণা ছিল দর্শনে, এখন জানলাম, না, বাঙলায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটা লেকচারারের চাকরি পেয়ে ঢাকায় চলে যায় সস্ত্রীক। পরে ওখান থেকেই পি. এইচ. ডি করে। দীপান্বিতা সেই যে প্রাক-স্বাধীনতা যুগে ঢাকায় চলে যায় তারপর আর ভারতে ফিরে আসার সুযোগ পায়নি। ইতিমধ্যে ওর বাবা এবং মা মারা গেছেন। খুড়তুতো ছোট বোন শিবানীর বিয়েতে নিমন্ত্রণপত্র পেয়েছিল—আসা হয়নি। ইতিমধ্যে পূর্ব-পাকিস্তান হয়েছে বাংলাদেশ। সে সময়ে দু-দেশের মধ্যে যাতায়াত কিছুটা সহজ হয়েছিল, তবু ওর আসা হয়নি। ওদেরও একটিমাত্র সন্তান—অনিরুদ্ধ। ঢাকা মেডিকেল কলেজ থেকে পাশ করে এম. ডি. করতে লন্ডনে যায়। আর ফেরেনি। একটি বিদেশিনীকে বিবাহ করেছে। সেও আজ প্রায় দশ বছর। 'ফেরেনি' মানে পাকাপাকিভাবে। দু-বছর অন্তর ঢাকায় আসে সস্ত্রীক। বাপির জন্য, মামির জন্য হাজার কিসিমের বিদেশী জিনিস নিয়ে আসে।

অনিরুদ্ধের বিবাহ হয়েছে প্রায় দশ বছর। কিন্তু সন্তানাদি হয়নি।

দীপান্বিতা বৌমার কাছে জিজ্ঞেস্ করে জেনেছে, তার হেতু নিতান্ত জৈবিক—ওদের দুজনের কারও অনিচ্ছাজনিত কারণে নয়—অনেক রকম চিকিৎসা করিয়েছে। ফল হয়নি।

পুরানো কথা বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গিয়ে কমল বলে, দীপান্বিতার জন্মও যে এক 'অলৌকিক-কাণ্ড'—আই মীন 'মিস্টিরিয়াস্' কাণ্ড, তা তুই জানিস?

আমাকে অজ্ঞতা প্রকাশ করতে হল। ওর বাবা ছিলেন পাড়ার নামকরা ডাক্তার। দীপান্বিতা আমাদের পাড়ার একটি সুন্দরী মেয়ে—ডাক্তারবাবুর মেয়ে—

সবাই চিনতাম ; কিন্তু তার জন্ম-ইতিহাস জানব কেমন করে ?

কমল বললে, তুই তো জানিস আমার শ্বশুরমশাইও ছিলেন ডাক্তার ; কিন্তু বিবাহের পর প্রথম পনের বছর তাঁরও কোন সন্তানাদি হয়নি। একই হেতুতে। নিতার বাবাও চেষ্টার ত্রুটি করেননি। দিল্লি, বোম্বাই, মাদ্রাজের নামকরা গাইনিদের পরামর্শ নিয়েছেন, চিকিৎসা করিয়েছেন। ফল হয়নি। তারপর একদিন ওঁর সম্পর্কে এক কাকা ওঁকে পরামর্শ দেন একটি বিশেষ কালী-মন্দিরে গিয়ে পুজো দিতে। আলোচনাটা হচ্ছিল এই ভাগলপুর শহরেই, ওঁদের পৈত্রিক আবাসে। শুনলেন, মন্দিরটি মুঙ্গের শহরের মাইল পাঁচেক দূরে—বিশালাক্ষীর মন্দির। ডাক্তারবাবুর খুব কিছু ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু নিতার মায়ের প্রবল ইচ্ছার চাপে উনি সেই মন্দিরে গিয়ে পুজো দিয়ে এলেন। তারপর....কী বলব ? লৌকিক অথবা অলৌকিক যাই হোক—বছরখানেকের মধ্যেই নিতার মায়ের গর্ভে শুভাগমন ঘটল নিতার।

আমি জানতে চাইলাম, ডাক্তারবাবু সস্ত্রীক মন্দিরে যাবার আগে কি গাইনি ডাক্তারের দেওয়া ঔষধ প্রয়োগ বন্ধ করে দিয়েছিলেন ?

কামাল হাসতে হাসতে বললে, আজ্ঞে না, তর্কচঞ্চু ! সম্ভবত নয়। তবে সে-সব অনেককাল আগেকার কথা। আমি জানি না। মানে নিতাও জানে না ! মোটকথা, আদালতে দাঁড়িয়ে হলফ নিয়ে ও-কথা বলতে পারব না।

—নিতা এখন কোথায় ? ওদের পৈত্রিক বাড়িতে ?

—বলছি। আগে গল্পটা শেষ করি।

—কর !

মাসকয়েক আগে শিবানী তিওয়ারী—মানে দীপান্বিতার খুড়তুতো ছোটবোন—জানালো যে, তার ছোট ছেলের বিয়ের দিন স্থির হয়েছে। আবদার করে এয়ার লেটারে লিখেছিল, দিদি, আমার দুই মেয়ের বিয়েতেই তুই আসতে পারিসনি। আমিও অবশ্য অনিরুদ্ধের বিয়েতে ঢাকা যেতে পারিনি। তা সে সব পুরানো কথা থাক। এবার এই ছোট্টুর বিয়েতে তোরা দুজন আসতে পারিস না ? কতদিন, কত্তো-দিন তোকে দেখি না, দিদি !

কামাল আপত্তি করছিল। বলেছিল, দেখ নিতা, তোমার বোনের বিয়ে হয়েছে বিহারী পরিবারে—ওঁরা ত্রিবেদী-ব্রাহ্মণ। প্রচণ্ড সম্ভাবনা যে, তাঁরা কট্টরপন্থী ! বিয়েবাড়িতে মুসলমান রিস্তেদার হাজির করে কেন অহেতুক তাঁদের বিব্রত করবে ?

দীপান্বিতা কিন্তু নাছোড়বান্দা। বলে, শোন বলি। আমরা কোন খবর দিয়ে যাব না। সোজা গিয়ে উঠব ভাগলপুরের কোনও হোটেলে। মীরাকে মনে আছে? না, তুমি বোধহয় তাকে দেখনি। ও ভাগলপুরে থাকে, মাসে মধ্যে চিঠি দেয়। ও চিঠিতে লিখেছে—ঠিক একই সময়ে ভাগলপুরে একটা সাহিত্যসভা হচ্ছে। ওরা কলকাতা থেকে নরেনদাকে সভাপতি করে নিয়ে যাচ্ছে। নরেনদা তোমার সহপাঠী—স্কুলে এবং কলেজে! তাই তুমি সস্ত্রীক ভাগলপুরে এসেছ। তারপর আমরা দুজন ঠিকানা খুঁজে ওদের বাড়িতে যাব। জাস্ট দেখা করতে। প্রেজেন্টেশান দিতে। বিয়ের আগের দিন। ওরা যদি আগ্রহ দেখায়, খাওয়ার নিমন্ত্রণ করে তবে যাব। খাব। সেসব কথা ওরা যদি না তোলে, তবে খোশগল্প করে হোটেলে ফিরে আসব।

কামাল জানতে চেয়েছিল, তোমার আসল মতলবখানা কী বলত?

দীপান্বিতা সেটা অকপটে স্বীকার করে, তুমি আমাকে একবার মুঙ্গের নিয়ে যাবে? ভাগলপুর থেকে কাছেই। আমিও একটা পুজো দিয়ে দেখতাম বিশালাক্ষী মাকে!

কামাল অট্টহাস্য করে উঠেছিল, কী পাগলের মতো বকছ নিতা! তোমার বাবা-মা ছিলেন হেঁদু! কট্টর বামুন! কিন্তু তুমি মোছলমানের জরু! যার সন্তান-কামনায় পুজো দিতে চাইছ সে শুধু মোছলমানের জরু নয়, জন্মসূত্রে খেষ্টান!

দীপান্বিতা বলল, সে সব তোমাকে ভাবতে হবে না।

—না, নিতা, আমাকেও ভাবতে হবে। আমি রাজি আছি। পাসপোর্ট-ভিসা করতে দিচ্ছি। ভাগলপুর নিয়ে যাব তোমাকে। নরেনের সঙ্গে পঞ্চাশ বছর পরে দেখা হবে, সেটাও আমার কম প্রাপ্তি নয়। তাছাড়া শ্বশুরবাড়ির দেশটা এরপর আর দেখার সুযোগই হয়তো হবে না। আমারও সত্তর চলছে! কিন্তু একটা শর্ত আছে, বল মেনে নেবে?

—কী শর্ত?

—তুমি মন্দির পুরোহিতকে সব কথা খুলে বলবে। 'দীপান্বিতা চৌধুরী' নাম শুনে তিনি যেন ভুল না বোঝেন। ধরে নেন তুমি হিন্দু।

দীপান্বিতা রাজি হয়ে গিয়েছিল।

ওরা আজ দিনসাতেক হল ভাগলপুরে এসেছে। মমতাজ হোটেলে উঠেছিল দুজনে। সাইকেল-রিকশা নিয়ে শিবানীর শ্বশুরবাড়িতে পৌঁছেই বুঝল পরিস্থিতিটা। ওরা যেন ভূত দেখল। বস্তুত ওরা কেউ স্বপ্নেও ভাবেনি ও-পার বাঙলা থেকে

কামালুদ্দীন চৌধুরী সাহেব সস্ত্রীক নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে এভাবে বেমক্কা চলে আসবেন। যা হোক, চক্ষুলজ্জা বাঁচিয়ে দু-পক্ষই লৌকিকতা করেছে। শিবানী জনান্তিকে দিদির বুকে মুখ লুকিয়ে ঝরঝরিয়ে কেঁদেছে। তারপর গঙ্গাস্নান করে ঘুরে ঢুকেছে কি না, ইতিহাস সে-প্রসঙ্গে নীরব। বস্তুত কামালের গল্পটা—'অলৌকিক অথবা লৌকিক' গপ্পোটা শিবানীর ছেলে ছট্টুর বিবাহ সংক্রান্ত নয়—ঐ কালীমন্দির ঘিরে।

ভাগলপুর থেকে মুঙ্গের একবেলার পথ। প্যাসঞ্জার ট্রেনে। কিন্তু যাত্রীরা রেলের আইন-কানুন কিছু মানে টানে না। ওদের ফার্স্ট ক্লাস টিকিট কাটাটা নেহাৎ মূর্খামি হয়েছে। বিনা টিকিটের যাত্রীর ভিড়ে নিশ্বাস ফেলার অবকাশ ছিল না ওদের দুজনের।

মুঙ্গেরে একদিন থাকবার জন্য প্রস্তুত হয়ে এসেছে। উঠল হোটেলে। হোটেল ম্যানেজারই গাড়ির ব্যবস্থা করে দিল। বিশালাক্ষীর মন্দির শহরের বাইরে, গঙ্গার ধারে। তবে মটোর যাতায়াতের উপযুক্ত কাঁচা রাস্তা আছে। হোটেলে ও নাম সই করেছিল 'কে. চৌধুরী', ফলে জাতির প্রশ্নটা ওঠেনি। খবর নিয়ে জানতে পারল বিশালাক্ষীর মন্দিরটি প্রায় দু শ' বছরের পুরানো। আদিবাসী যাযাবর সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠিতা দেবীমূর্তি। সে-যুগে মায়ের নাম ছিল : বিষ-লক্ষ্মী। যাযাবর সম্প্রদায় সাপের খেলা দেখাতো—সাপুড়ে ছিল তারা। ক্রমে সেই আদিবাসীদের নির্মূল করে যাদব সম্প্রদায় মন্দিরটার দখল নেয়। তারও পরে—প্রায় সত্তর-আশি বছর আগে—এক ব্রাহ্মণ জমিদার মন্দিরটি নতুন করে গড়ে দেন। নিত্যপূজার ব্যবস্থা করে বিশ বিঘে লাখেরাজ নিষ্কর ভূমি দান করেন মন্দির পুরোহিতকে। সেদিন থেকে মা এসেছেন ব্রাহ্মণ সমাজের কব্জায়। তাঁর নামেও পরিবর্তন হল। 'বিষ-লক্ষ্মী' হলেন 'বিশালাক্ষী'। এককালে যাত্রী সমাগমে মন্দির গমগম করত। ইদানীং বড় একটা কেউ ও দিকে যায় না—মা গঙ্গাও যে মন্দিরকে ছেড়ে বহু দূরে সরে গেছেন ক্রমে।

দীপান্বিতা পুরোহিতকে একটা একশ টাকার নোট প্রণামী দিয়ে প্রণাম করল। অকপটে সব কথা স্বীকার করল। সে নিষ্ঠাবতী ব্রাহ্মণ সন্তান—ভাগলপুরে বাড়ি ; কিন্তু বিয়ে করেছে একজন মুসলমানকে। যার পুত্রকামনায় সুদূর ঢাকা থেকে ছুটে এসেছে সে ওর পুত্রবধূ—জন্মসূত্রে প্রটেস্টান্ট : খৃষ্টান।

পুরোহিত বোধকরি তাঁর জীবনে একবারও একশ টাকার নোট প্রণামী পাননি। বিশুদ্ধ হিন্দিতে বললেন, ভক্তিই হচ্ছে সাচ্চা চীজ মাঈ! তুই মন্দিরে

ঢুকিস্ না। তোর নাম-গোত্র বল। আমি এখনি পুজো দিয়ে প্রসাদী নিয়ে আসছি।

দীপান্বিতা বললে, বাবা। আমার নাম দীপান্বিতা চৌধুরী, কিন্তু গোত্র....

পুরোহিত বললেন, বাঃ! বাঃ! দীপান্বিতা! এ তো মা বিশালাক্ষীর আর এক নাম! তোর পিতাজীর গোত্রটাই বল না হয়।

দীপান্বিতা বলল : ভরদ্বাজ!

—বহুৎ খুব। ঔর তেরা বহুমাঈকী ক্যা নাম?

—ক্যাথলিন চৌধুরী!

—বাঃ! বহুৎ খুব। ক্যাথিলিন! বহ্‌ভি তো বিশালাক্ষী মাঈকী কি ঔর এক নাম।

তা জানা ছিল না দীপান্বিতার।

মোটকথা নির্বিবাদে পুজোপর্ব মিটল।

হোটেল-ম্যানেজার পরামর্শ দিলেন, ট্রেনে কেন ফিরবেন ভাগলপুরে? এখান থেকে ডিলুক্স-বাস আছে। সাড়ে সাত ঘণ্টার মধ্যে আরামসে পৌঁছে যাবেন ভাগলপুরে। ইঁহা সে সুবে সাত বাজে ছোড়তি, ঔর তিন বাজে ভাগলপুর। বিচমে ঘণ্টাভরকে লিয়ে সুলতানগঞ্জমে রুখেগি, খানা খানেকে বারেমে।

কামাল জানতে চেয়েছিল, সীট রিসার্ভ করানো যাবে তো?

—বিলকুল!

হোটেল ম্যানেজার লোক পাঠিয়ে পরদিন সকালের সুপার ডিলুক্স বাসের দু-খানি টিকিট খরিদ করিয়ে দিল : সব্‌সে উমদা সীট! ড্রাইভারের পিছনে, ঠিক ডানদিকে। সীট নম্বর এক আর দুই!

সকাল সাতটায় বাস ধরে ওরা রওনা দিল ভাগলপুরমুখো। সুলতানগঞ্জ পর্যন্ত এল নির্বিঘ্নে। এখানে বাস একঘণ্টা দাঁড়াবে। সকলে সামনের হোটেলে মধ্যাহ্ন আহার সারবে। বাসের কন্ডাকটার বললে, সামানকো বারেমে বে-ফিকর রহিয়ে সাব। যাইয়ে, আরামসে খানা খা-কে আইয়ে। লেকিন য়্যাদ রাখিয়েগা, একবাজে বাস ফিন্ ছুটেগি।

আহারের চেয়ে বেশি প্রয়োজন একবার টয়লেট যাওয়া। যাহোক, আহারাদি সেরে মুখে-চোখে জল দিয়ে আধঘণ্টার মধ্যেই দুজনে ফিরে এসে বসল নিজের-নিজের সীটে। দীপান্বিতা বসেছে জানলার ধারে। একে-একে যাত্রীরা ফিরে আসছে। আসন গ্রহণ করছে। প্রায় পৌনে একটার সময় একজন তক্‌মা-আঁটা

পুলিশ এসে কমলকে বললে, আপ দোনো মেহেরবানি করেক সাতারা-আঠারা সীটমে চলা যাইয়ে।

কামাল সবিস্ময়ে প্রশ্ন করে, কেঁউ ?

—বড়াসাব ভাগলপুর যায়েঙ্গে !

—বড়াসাব ? কৌনসে বড়াসাহ্‌ব ?

সেপাইটা বুঝিয়ে দিল, সুলতানগঞ্জ পুলিশ স্টেশনের বড় দারোগা এই বাস-এ ভাগলপুর যাচ্ছেন। সঙ্গে একজন দোস্তও আছেন। উনি যখনই বাস-জার্নি করেন তখন এক নম্বর সীটে বসেন। কামাল জানতে চাইল, ওঁর টিকিটের নম্বর কত ?—সেপাইটা হেসেই বাঁচে না। পুলিশের দারোগা আবার বাসের টিকিট কাটে নাকি কোনদিন ? কামাল স্রেফ জানিয়ে দিল—তোমার বড়সাহেব যদি বিনা টিকিটের যাত্রী হন তাহলে তাঁকেই বল পিছনের সীটে গিয়ে বসতে। আমি সীট ছাড়ব না।

সেপাইটা অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ। বিহাররাজ্যের চৌহদ্দির মধ্যে এ জাতীয় কথা কেউ বলতে পারে তা ওর বিশ্বাসই হচ্ছিল না। ক্রমশ উষ্ণবাক্য বিনিময়। প্রায় হাতাহাতি হবার অবস্থা যখন, তখন বাস ছাড়তে আর পাঁচ-মিনিট, ড্রাইভার এসে বসল তার আসনে। জানতে চাইল ! ক্যা বাত ?

সেপাই তাকে বুঝিয়ে বলার অবকাশ পেল না। তার আগেই দারোগাবাবার আবির্ভাব ঘটল বাসের অভ্যন্তরে। তার সঙ্গে একজন ষণ্ডামার্কা লোক। কামাল পরে জেনেছিল—সে লোকটা মুঙ্গের অঞ্চলের একজন নামকরা অ্যান্টিস্যোশাল। দু-তিনটে ডাকাতি এবং একটি নরহত্যার মামলা ঝুলছে তার মাথায়, যদিও সদাশয় হাইকোর্টের দয়ায় সে জামিনে খালাস আছে।

সেপাইটা দারোগাবাবাকে বুঝিয়ে দিল ব্যাপারটা।

দারোগা স্বয়ং কেসটা টেক্-আপ্ করলেন। বিশুদ্ধ ভাগলপুরী দেহাতী ঠেট্-হিন্দিতে বললেন, আপনাদের দুজনকে এই সেপাইটা বারে বারে বল্‌ছে সতের-আঠারো সীটে গিয়ে বসতে। আপনি শুনছেন না কেন ?

কামাল বললে, তার একটি মাত্র হেতু। আমি অগ্রিম টাকা দিয়ে সীট নম্বর ওয়ান অ্যান্ড টু রিজার্ভ করেছি।

দারোগা বললেন, কই, দেখি আপনার টিকিট ?

কামাল তৎক্ষণাৎ টিকিট দুটো বার করে দারোগাকে দেখালো। লোকটা টিকিটের নম্বর দুটো তাকিয়েও দেখল না। হাতে নিয়ে কুচি-কুচি করে ছিঁড়ে

জানলা গলিয়ে ফেলে দিয়ে বললে, এখন ? এখন তো মানবেন যে, আপনি বিনা-টিকিটের যাত্রী ? যান, পিছনের ঐ দুটো সীটে গিয়ে বসুন ! নাহলে....

—না হলে ?

—অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি, সেক্ষেত্রে আপনাকে আমি অ্যারেস্ট করতে বাধ্য হব।

কামালও রুখে ওঠে, করুন ! দেখি আপনার হিম্মৎ। তবে একটা কথা আপনাকে এখনি জানিয়ে রাখি দারোগা-সাহেব। আমার নাম কামালুদ্দীন চৌধুরী—আজিজুল হক-সাহেবের নাম শুনেছেন ? আপনাদের ক্যাবিনেটে এডুকেশন মিনিস্টার ? তিনি আমার চাচেরা ভাই। রিস্তেদার। আপনার হিম্মৎ থাকে তো পরান আমার হাতে হাতকড়া। এক বাস লোক সাক্ষী রইল। দেখি আপনার হিম্মৎ ! আপনিও দেখবেন, ডিমোশান না হলেও একমাসের মধ্যে এ স্টেশান থেকে আপনাকে বদলি করাতে পারি কি না !

দুটি হাত মুষ্টিবদ্ধ করে সে বাড়িয়ে দিল দারোগার দিকে।

আজিজুল হক-সাহেবের নামটা কামাল সেদিনই খবরের কাগজে দেখেছে। বিহারের এডুকেশন মিনিস্টার।

দারোগা ওর দিকে পুরো দশ-সেকেন্ড জ্বলন্ত দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে রইল। কামালও বাঘের বাচ্চা। সেও তাকিয়ে রইল দারোগার দিকে। কারও চোখে পলক পড়ল না।

তারপর দারোগা কামালকে কিছু বলল না। ড্রাইভারকে বলল, আমি ঐ চায়ের দোকানে গিয়ে বসছি। আমার অর্ডার ছাড়া বাস ছাড়লে তোমার লাইসেন্স বাতিল হয়ে যাবে। পকেট থেকে নোটবই বার করে গাড়ির নম্বরটা টুকে নিয়ে নেমে যেতে গেল সে। ড্রাইভার জোড়হাতে জানতে চাইল, মেরা ক্যা কসুর, হজৌর ?

—তোমার ডিফারেনশিয়াল বক্সে গড়বড়ি আছে। টাইরড-এর নাটগুলো টাইট দেওয়া নেই। আমি থানায় খবর পাঠাচ্ছি। মোটর-ভেহিক্‌ল্‌স্‌ ইন্সপেক্টার এসে দেখুক। সে ছাড় দিলে বাস ছাড়বে।

দারোগা নেমে গেল বাস থেকে। গিয়ে বসল চায়ের দোকানে। দারোগার প্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গে বাসশুদ্ধ লোক ঘনিয়ে এল। কামালের হাতে-পায়ে ধরতে। এ অঞ্চলের রেওয়াজ, দারোগাবাবার জন্য পয়লা নম্বর সীট অলিখিতভাবে রিজার্ভ। কত লোকের কত জরুরি কাজ। সব ভেস্তে যাচ্ছে ওদের দুজনের

জেদাজেদিতে। কামাল বলল, আমি ওসব কথা শুনতে চাই না। দারোগা যদি বিনা টিকিটে যেতে চায় তবে তাকে ঐ সতের নম্বর সীটে বসে যেতে হবে।

বাসের ড্রাইভার বললে, কিন্তু আপনার কাছে তো এখন এক-দুই নম্বর টিকিট নেই, স্যার। আভি তো কোই টিকস্ ভি নহি!

—আছে! পাটনায় চলে যাও। এখন ক্যাবিনেট সেশন চলছে। এডুকেশন মিনিস্টারের জেব-এ আমার দুখানা টিকিটই রাখা আছে! গিয়ে খোঁজ নাও। আমার নাম কামালুদ্দীন চৌধুরী—এই দেখ আমার পাসপোর্ট। তাঁর নাম আজিজুল হক। আমি তাঁর রিস্তেদার। তাঁর বাড়িতেই আমি উঠেছি পাটনায়। তিনি এডুকেশন মিনিস্টার। আমি ঐ দারোগাকে কানে ধরে ওঠবোস করাবো! তোমরা দেখে নিও!

এরপর আর কেউ কোন কথা বলতে সাহস পেল না। অনেকেই নেমে গেল বাস থেকে। হয় বাইরের হাওয়া খেতে অথবা আর কোন বাস ভাগলপুর যাচ্ছে কি না জানতে। ড্রাইভারও নেমে গেল চায়ের দোকানে। করজোড়ে দারোগাবাবাকে সে কী নিবেদন করল বোঝা গেল না। কান ধরে ওঠবোস করানোর কথা সে নিশ্চয় বলেনি ; কিন্তু এটুকু হয়তো বুঝিয়ে বলতে পেরেছে যে, এই কামালুদ্দীন সাব হক-সাহেবের রিস্তেদার। পাটনায় মিনিস্টারের সরকারী কোয়ার্টার্সেই উঠেছেন। ওঁর পকেটে পাসপোর্ট আছে। কেওকেটা ব্যক্তি। কিন্তু ব্যাপারটা এখন প্রেস্টিজের লড়াই-এ পরিণত হয়েছে। দারোগা এখন অন্য রাস্তা ধরেছে। সে এখন বলছে, বাসটাকে রুখেছে অন্য কারণে। ওর যান্ত্রিক গণ্ডগোল আছে। ডিফারেনশিয়াল বক্সে, আর টাই-রডে। সে এ বাসে আদৌ যাবে না। থানা থেকে জিপ আনবার আদেশ দিয়েছে। কিন্তু মোটার ভেহিক্‌ল্‌স্ ইন্সপেক্টারের একটা ইন্সপেকশান জরুরি। এতগুলো ইনসানের জান নিয়ে কথা....

দীপান্বিতা এতক্ষণ কোন কথা বলেনি। কামালের মনে হল সে হঠাৎ ঝুঁকে পড়ে ওর কানে-কানে বললে : বর্তে দেনা। O.K.! বর্তে চাইছে যখন নিচে থেকে।

কামাল চমকে ওঠে। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে দীপান্বিতা সবিস্ময়ে তাকিয়ে আছে ওর দিকে। কামাল জিগ্যেস করতে গেল, 'কী বললে? তোমার কথা কিছুই বুঝতে পারলাম না আমি'—কিন্তু সে কথা বলার আগেই দীপান্বিতা ওকে প্রশ্ন করে : হঠাৎ তুই-তোকারি শুরু করলে যে! আর কী বললে বলত? বুঝতেই পারলাম না আমি।

কামাল সবিস্ময়ে স্ত্রীকে বললে, আমি বললাম ? তোমাকে ? কী বললাম ?

—তাই তো জানতে চাইছি। মনে হল তুমি বললে, "বসতে দেনা, O.K. বসতে চাইছে যখন নিচে দেখে।"

দুরন্ত বিস্ময়ে কামাল বলে, ঠিক শুনেছ ? 'বসতে' বলেছি আমি ?

—না ! আমার মনে হল, তুমি বললে : 'বর্তে'। কিন্তু তার তো কোন মানে হয় না। তাই ভাবলাম.....

কামাল বাধা দিয়ে বলল, না। আমি ও কথাটা বলিনি।

—তবে কে বলেছে ?

—জানি না। আন্দাজ করছি যাত্রীদের মধ্যে কেউ একজন 'ভেন্ট্রিলোকুইস্ট' আছে।

—তার মানে ?

—ও এক রকমের ম্যাজিক। দূর থেকে তারা এমনভাবে কথা বলে যাতে মনে হয় পাশের লোক বলছে।

দীপান্বিতা জবাব দেবার সময় পায় না। তার আগেই এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক এগিয়ে এসে বিশুদ্ধ হিন্দুস্থানীতে বললেন, বাবুজী ! গোস্তাকি মাফ্ করবেন। আমার নাম হরদয়াল মিশ্র। আমার নাতি একটা স্কুটার অ্যাক্সিডেন্ট করে ভাগলপুর হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। ভোর রাতে টেলিফোন পেয়েই ছুটেছি। আমার স্ত্রীও....

ভদ্রলোক হাত বাড়িয়ে বৃদ্ধাকে দেখিয়ে দিলেন। বৃদ্ধা পিছনের সীটে বসেছিলেন। উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর দু-চোখে দুটি জলের ধারা। হাত দুটি জোড় করা।

তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়াল কামাল। বললে, আপনাদের দেরী করিয়ে দিয়েছি বলে মাফি চাইছি। এস নিতা—আমরা ঐ পিছনের সীট দুটোয় গিয়ে বসি।

তিন-চার নম্বরের যাত্রী দুজন বললেন, না, না, অত পিছনে যাবেন কেন ? তকলিফ হবে আপনাদের। আমরা দুজন সতের-আঠারয় গিয়ে বসব। আপনারা ঠিক পরের এই দুটো সীট....

কামাল বাধা দিয়ে বললে, বহুৎ বহুৎ সুক্রিয়া। কিন্তু, কী জানেন ? ঐ ঘুষখোর দারোগার ঠিক পিছনেই আমি বসতে পারব না। ওর গা দিয়ে ঘুষের বদ-বু বার হচ্ছে !

মুখ লুকিয়ে সবাই হাসল। কামাল সস্ত্রীক সরে এল সতের-আঠারয় !

দারোগাবাবা স্বচক্ষে দেখলেন। তবু গাত্রোত্থান করলেন না। ড্রাইভার-কন্ডাকটার বোধকরি কামালের হয়ে মাফি মাঙল। তারপর উনি ওঁর অ্যান্টিস্যোশাল সহকারী দোস্তকে সঙ্গে নিয়ে এসে বাসে উঠলেন। সীট নং এক-দুইয়ে।

বাসটা ছাড়ল!

আমি বললাম, এই তোর কিস্‌সা? এর মধ্যে অলৌকিকত্ব কোথায়? তুই ঠিকই ধরেছিলি। বাসে নিশ্চয় কোন 'ভেন্ট্রিলোকুইস্ট' ছিল।

কমল ঘড়ি দেখে বলল, পৌনে চারটে বাজল। নে ওঠ। আর দেরি করা চলবে না।

—কেন? আমার তো সাড়ে ছয়টায় সাহিত্যসভায় ফিরে যাবার কথা।

—না, তোর নয়। আমার অ্যাপয়েন্টমেন্ট চারটেয়।

—কার সঙ্গে? কোথায়?

—সদর হাসপাতালে। বাঃ! মনে নেই, মিশিরজীর সেই নাতিটি স্কুটার অ্যাক্‌সিডেন্ট করে হাসপাতালে পড়ে আছে।

—তার সঙ্গে তোর কী সম্পর্ক?

—'Love thy neighbour' -এর সম্পর্ক। ওঠ্ ওঠ্। ঠিক চারটে থেকে ভিজিটিং আওয়ার্স।

অগত্যা পাগলটার সঙ্গে রিকশা চেপে এসে হাজির হলাম ভাগলপুরের সদর হাসপাতালে। দুর্ভাগ্য আমাদের—সেই স্কুটার দুর্ঘটনার রোগীটির ছুটি হয়ে গেছে। তার বেড-টা খালি। নতুন রোগী এখনো আসেনি।

আমি জানতে চাই, এখন কী করবি?

—দোতলায় যাব। নিতা এখানেই দোতলার একটা কেবিনে আছে।

—নিতা? দীপান্বিতা! কেন? কী হয়েছে তার?

—অহেতুক তর্ক করছিস কেন, তর্কচঞ্চু? আয় আমার সঙ্গে সঙ্গে। চক্ষুকর্ণের বিবাদ ভঞ্জন হয়ে যাবে।

দ্বিতলে কেবিনের হাফ্ রিভলভিঙ্ দরজার নিচ দিয়ে দেখা যাচ্ছিল ঘরে আরও লোক রয়েছেন। দরজা ঠেলে ঢুকতেই একটি প্রৌঢ়া উঠে দাঁড়ালেন। কামালকে হিন্দিতে বললেন, আসুন জামাইবাবু। আন্দাজে বুঝলাম, তিনিই শিবানী। সঙ্গে বোধহয় তাঁর স্বামী তিওয়ারীজী। দীপান্বিতা শুয়ে আছে। বাঁ-পায়ে প্লাস্টার করা। ঠ্যাংটা দড়ি দিয়ে টাঙানো। ওকে শেষ যখন দেখেছিলাম তখন ও অষ্টাদশী। এখন আটষট্টি। না চিনিয়ে দিলে পথেঘাটে দেখলে নিশ্চয়

চিনতেই পারতাম না। কমল বললে, দেখ, কাকে ধরে এনেছি!

দীপান্বিতা হাত দুটি জোড় করে বললে ঐ একই কথা। পথেঘাটে দেখলে তোমাকে চিনতেই পারতাম না, নরেনদা! এ কী চেহারা হয়েছে গো তোমার! একেবারে বুড়ো!

আমি বলি বটে! আর তুমি! তপ্তকাঞ্চনবর্ণা, পাড়ার ছেলেদের রাতের ঘুম-কাড়া। চকিত হরিণীপ্রেক্ষণা.....

কমল বলল, থাক থাক! ঐখানেই থাম্! পরের লাইনটা অনুচ্চারিতই থাক....

আমি বলি, পড়ে গিয়ে পা ভাঙলে কী করে?

দীপান্বিতা বলে, ওমা পড়ে যাব কোন দুঃখে! আমি কি তোমার মতো বুড়ো! তোমার বন্ধু বলেনি? আমরা দুজন যে যমের দ্বার থেকে ফিরে এলাম!

আমি কমলের দিকে ফিরতেই ও বললে, হ্যাঁ, সিরিয়াস্ বাস অ্যাক্সিডেন্ট। সুলতানগঞ্জ থেকে ভাগলপুর আসার পথে। কাগজে পড়িসনি? আমার গায়ে আঁচড়টি লাগেনি, কিন্তু চারজনের অবস্থা খুব সিরিয়াস!

—কী হয়েছিল?

—তুই বিশ্বাস করবি না, নরেন, কিন্তু থানা-ইন-চার্জ বানিয়ে বানিয়ে যে মিথ্যা অজুহাত দেখিয়ে গাড়িটা রুখে দিয়েছিল, ঘটনাটা বাস্তবে তাই। বাসের টাইরডের নাট-বল্টুগুলো আল্‌গা হয়ে গেছিল। কী আশ্চর্য কাকতালীয় মর্মান্তিক প্রেডিক্‌শান। তাই নয়?

আমি বলি, তারপর?

বাসটা ভাগলপুর শহর থেকে তখনো মাইলদশেক দূরে। গতিবেগ ঘণ্টায় পঞ্চাশ থেকে পঞ্চান্ন। হঠাৎ স্টিয়ারিঙ ঘোরাতে গিয়েই ড্রাইভার টের পায় টাইরড কেটে গেছে। গাড়ি তার নিয়ন্ত্রণে নেই। মাতালের মত সারা রাস্তা জুড়ে টালমাটাল ছুটছে। ড্রাইভার অবস্থা বুঝে লাফ দিয়ে নেমে পড়ে। কন্ডারটারও তাই। গাড়িটা গিয়ে যখন পথপার্শ্বের প্রকাণ্ড রেইনট্রি গাছে প্রচণ্ড ধাক্কা মেরে উল্টে যায় তখন বাসের বত্রিশজন যাত্রীই এ ওর ঘাড়ে। জনা পনের ফার্স্ট-এড নিয়ে বাড়ি যায়। সাত-আটজনকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়। বাকিরা আমারই মতো অনাহত। একজন একেবারে মরণাপন্ন। বাঁচার আশা খুবই কম।

দীপান্বিতা আগ বাড়িয়ে বললে, লোকটা জামিনে খালাশ ছিল। দু-নম্বর সীটে বসেছিল। একটা পাক্কা অ্যান্টিস্যোশাল!

আমি ঝুঁকে পড়ে বলি, আর এক নম্বর সীটের যাত্রীটি ?

দীপান্বিতা বললে, স্যাড কেস ! লোকটা লোকাল থানার দারোগা। তার মৃতদেহকে সনাক্ত করাই কঠিন হয়ে গেছিল। গাছের ধাক্কাটা ডিরেক্টলি ওরই ওপর পড়ে। একেবারে থেঁৎলে গেছিল !

আমি কমলের দিকে ফিরতেই ও বলে, অলৌকিক নয় ভাই ! বিশ্বাস কর: পুরোপুরি লৌকিক ! এমনটা তো হয়েই থাকে। ইট্‌স্ জাস্ট অ্যান অ্যাকসিডেন্ট।

দীপান্বিতা তার স্বামীকে বলে, শুনছ ? একটা সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে। শুয়ে শুয়ে ঐ কথাটাই ভাবছিলাম তো ? হঠাৎ সল্যুশান পেয়ে গেছি।

কমল জানতে চায়, কোন কথাটার ?

—ঐ অজ্ঞাত ভেন্ট্রিলোকুইস্টের উচ্চারিত বাক্যটার পাদপূরণ হয়ে গেছে। তুমি-আমি দুজনেই ভুল শুনেছিলাম—মানে ঠিকই শুনেছিলাম, ভুল বুঝেছিলাম। শব্দটা 'বর্তে' নয় 'মরতে' ; 'দেনা' নয় 'দে না', আর 'O.K.' নয় 'ওকে'। ভেন্ট্রিলোকুইস্ট যা বলেছিলেন তা, "মরতে দে না ওকে ! মরতে চাইছে যখন নিজে থেকে।"

শিবানী এতক্ষণ কোনও কথা বলেনি। এবার ধমক দিয়ে ওঠে, এই জন্যেই তোদের ম্লেচ্ছ বলে ! ম্যাজিক হতে যাবে কোন দুঃখে ? এ তো মা বিশালাক্ষীর দৈববাণী !

কামাল জানতে চায়, বিশালাক্ষী না বিষলক্ষ্মী ? তারপর আমার দিকে ফিরে বলে, তুই কি বলিস, সাহিত্যিক ? 'ভেন্ট্রিলোকুইস্‌ম্' না 'ডিভাইন জাস্টিস ?' আই মীন, লৌকিক না অলৌকিক ?

একটি বিচিত্র অভিজ্ঞতা

প্রায় বছর পনের আগেকার কথা। তখনো আমি চাকরি থেকে অবসর নিইনি। ঐ সময় অজন্তার উপর লেখা আমার একটি বইয়ের ইংরেজি অনুবাদ নিয়ে মেতে আছি। একটি সভায় আলাপ হল অধ্যাপক তারকমোহন দাশের সঙ্গে। তিনি তখন বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর পর্যায়ের শিক্ষাব্যবস্থায় উদ্ভিদবিজ্ঞানের সর্বাধ্যক্ষ। ঐ সময় তিনি একটি নতুন প্রযুক্তিবিদ্যার দিকে ঝুঁকেছেন : রঙিন স্বচ্ছচিত্র। শাদা বাঙলায় যাকে বলে 'কালার্ড ট্রান্সপেরেন্সি'। রঙিন স্বচ্ছচিত্র তুলবার ক্যামেরা পৃথক, অনেকেই তোলেন—বিশেষত দেশভ্রমণে গেলে। কিন্তু এগুলির পজেটিভ প্রিন্ট বানিয়ে অ্যালবামে সাজিয়ে রাখা হয় না। প্রক্ষেপণ যন্ত্রের সাহায্যে শাদা দেওয়ালে ফেলে সিনেমার স্ক্রিনের মাপে রঙিন বড় বড় ছবি দেখানো যায়। ফলে, প্রথম দু-চার সপ্তাহ আত্মীয়স্বজনকে ডেকে তা দেখানো হয়ে গেলে বাক্সবন্দি করে রেখে দেওয়া হয়। অনেকেরই অভিজ্ঞতা : দু-পাঁচ বছর পরে বার করে দেখতে গিয়ে টের পেয়েছেন স্লাইডে 'ছাতা' ধরে গেছে। প্রফেসর দাশ এই জাতীয় আলোকচিত্র-শিল্পীদের একত্র করে একটি অ্যাসোসিয়েশন গড়ে তোলেন। তাঁর উৎসাহে আমি ঐ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ি। বছরে আমাদের চার-পাঁচ বার মিলনোৎসব হত—এখনো হয়—এক-একবার এক-একজন সভ্য ছবি দেখান। বৎসরান্তে দু-দিনব্যাপী মহা-সম্মেলন হয়। তখন সারাদিনে দশ-বারোজন হয়তো নিজের নিজের তোলা ছবি প্রদর্শন করেন। এভাবে এই প্রযুক্তিবিদ্যার একটি নতুন দিগন্ত খোলা গেছে। যিনি দেখান এবং যাঁরা দেখেন সকলেই আনন্দ পান।

যে প্রসঙ্গে এত কথা বলা, এবার সে-কথায় ফিরে আসি।

প্রফেসর দাশ আমাকে বললেন, আপনার অজন্তার রঙিন ছবিগুলি দিয়ে

একটা ভালো প্রোগ্রাম হতে পারে। আমি ওঁকে জানাই যে, রঙিন স্বচ্ছচিত্র তুলবার উপযুক্ত ক্যামেরা আমার কাছে নেই। অধ্যাপক মশাই দমবার পাত্র নন। বললেন, আপনি একটি ফিল্ম কিনে ছবিগুলি নিয়ে আমার অফিসে আসুন একদিন। ক্যামেরা আমার আছে।

উনি স্বহস্তে ছবিগুলি তুলে দিলেন। বাড়িতে এনে সবাইকে দেখালাম। ক্যামেরা না থাকলেও প্রজেক্টার আমার ভাইপোর আছে। কদিন তাই নিয়ে মহা হৈ-চৈ হল। দু-একটি সাহিত্যসভায় রঙিন স্বচ্ছচিত্র দেখিয়ে অজন্তার উপর বক্তিমে করা গেল। তারপর যেমন হয়ে থাকে। পল্লবগ্রাহী মানুষের কাছে সেটাই প্রত্যাশিত। অজন্তা-চিত্র ছেড়ে আমি অন্য কী-একটা বিষয় নিয়ে মেতে উঠলাম।

একদিন সকালে বাড়িতে টেলিফোন বাজল। তুলে নিয়ে আত্মঘোষণা করতেই ধীরেশ বললে, হ্যাঁরে, এর পরের সপ্তাহে বুধবার সন্ধ্যায় তুই ফ্রি আছিস্ ?

আমি বলি, কেন বল্ তো ? ডিনারে নিমন্ত্রণ করবি ?

ধীরেশ আমার বাল্যবন্ধু। একটা খিস্তি ঝেড়ে বললে, বলছি সন্ধ্যার কথা, ও ডিনার খেতে চায় ! বেশ তো, না হয় তাই খাওয়াব। সন্ধ্যার মিটিং শেষ হলে ! রাজি ?

জানতে চাই, কীসের মিটিং ?

—মিটিং নয়, আমাদের অ্যাসোসিয়েশনের অ্যানুয়াল মীট। সারাদিনই চলবে। তুই সাড়ে পাঁচটায় আয় বরং। তোর অফিসে আমি গাড়ি পাঠিয়ে দেব। অ্যারাউন্ড পাঁচটা—

—আমি গিয়ে কী করব ?

—ঢেঁকি স্বর্গে গিয়ে যা করে—ধান ভান্‌বি। বক্তিমে !

জানতে চাইলাম, এটা কি রোটারি ক্লাব, না লায়ন্স ক্লাব ?

ও বললে, তোর মাথা খারাপ হয়েছে ? বলছি অ্যাসোসিয়েশন ?

—কিসের অ্যাসোসিয়েশন ?

—সেটা এলে জানতে পারবি। দ্যাট্‌স এ সারপ্রাইজ ! তুই বলিস্ আমরা ফিলানথ্রফিক কাজ কিছু করি না ! শুধু ক্লাবে গিয়ে মদ গিলি ! এবার এসে স্বচক্ষে দেখে যা।

আবার বলি, কিন্তু কী বিষয়ে বল্‌ব ?

—তোর যা মন চাইবে। বিষয়বস্তু সম্বন্ধে ওদের কোনও বাছ-বিচার নেই।

আমারও নেই। ওদের অনুরোধ এবছরের বার্ষিক অধিবেশনে তোকে প্রধান বক্তা করে আনতে হবে।

আবার বলি, ওরা-ওরা বলছিস, 'ওরা' কারা ?

ও উলটে ধমক দেয়, দেখ্ নারান ! বেশি রোয়াবি মারবি না ! এটা মহিলা কলেজের স্টুডেন্টস্ অ্যাসোসিয়েশন নয়, এটুকু বলতে পারি। তবে আমাদের জমায়েতে পুরুষ-মহিলা দুই-ই থাকবে। কিন্তু তোকে সেজন্য বিশেষভাবে সাজন-গোজন করতে হবে না। ওরা তোর রূপ দেখবে না, ওরা তোর কথা শুনতে চায় শুধু। রূপ যদি দেখতে চাইত তাহলে তোর বদলে সুচিত্রা কি উত্তমের দ্বারে হানা দিতুম, বুঝলি ?

ধীরেশটা এই রকমই পাগল। বড়লোকের ছেলে। বড় চাকরিও করে। নানান ক্লাব-অ্যাসোসিয়েশন নিয়েই মেতে আছে। আর কিছু না বলে বেমক্কা লাইনটা কেটে দিল সে।

তারপর ব্যাপারটা ভুলেই গেছি। পরের সপ্তাহে বুধবার সকালে ডায়েরি খুলে মনে পড়ল। আরে তাই তো ! কী বলব তা কিছু একটা স্থির করতে হয়। কিন্তু তাহলে জানতে হয় শ্রোতৃবৃন্দের প্রত্যাশাটা কী ? জমায়েতটা কিসের ? ওদের শিক্ষাদীক্ষার দৌড়টাই বা কতখানি ! মনে পড়ল বার্ট্রান্ড রাসেলের কথা। মার্কিন মুলুকে তিনি একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শন বিষয়ে পোস্ট-গ্রাজুয়েট স্টুডেন্টদের কাছে একটি বক্তৃতা করেছিলেন। বক্তৃতা শেষে প্রশ্নোত্তরের পালা। অধ্যাপক রাসেল জানতে চাইলেন, তোমাদের কোনও প্রশ্ন আছে ? কোনও সাধারণ মন্তব্য ?

একটি বুদ্ধিদীপ্ত ছাত্র উঠে দাঁড়িয়ে বলেছিল : নো সার ! বিকজ উই ফেল্ট দ্যাট য়োর লেকচার আন্‌ফরচুনেটলি পাস্‌ড্ অ্যাবাভ আওয়ার হেডস্ ! [আজ্ঞে না ! কারণ আমাদের মনে হয়েছে আপনার বক্তৃতাটি আমাদের মাথার উপর দিয়ে চলে গেল।]

রাসেল জবাবে বলেছিলেন, আমি দুঃখিত। আমার ধারণা ছিল, তোমাদের মাথাগুলো আরও ছয় ইঞ্চি উপরে অবস্থিত !

ছাত্রটি অবশ্য রসিকতা করেছিল, অধ্যাপকও তাই। কারণ প্রশ্নকারী ছাত্রটির নাম : উইল ডুরান্ট ! যাঁর লেখা বই 'দ্য স্টোরি অব ফিলজফি' মিলিয়ন্স কপি বিক্রি হয়েছে সারা পৃথিবীতে।

আমি বার্ট্রান্ড রাসেল নই ; কিন্তু শ্রোতৃবৃন্দের প্রত্যাশা এবং গড় শিক্ষাদীক্ষা সম্বন্ধে একটা ধারণা না থাকলে কী বলব ?

টেলিফোন করলাম ধীরেশের বাড়িতে। ধরল ওর বাচ্চাটা। বললে, ড্যাডি বাড়ি নেই। মাম্‌মি মার্কেটিঙে গেছে।

অফিস যাবার সময় বাড়িতে বলে গেলাম, ফিরতে রাত হতে পারে, কে জানে হয়তো রাতে খেয়েই ফিরব!

গৃহিণী বিরক্ত হন : রাত করে ফিরবে, সেটা তো বুঝলাম। কিন্তু রাতে খেয়ে ফিরবে, কি না খেয়ে ফিরবে তাও জান না?

বলি, কী করে জানব? ধীরেশের কাণ্ড! নেমন্তন্নটা করেছে, কিন্তু শুকনো বক্তিমে দেবার, না রাতে খেয়ে ফেরার—তা ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না।

—ঠিক আছে। খাবার ঢাকা দেওয়া থাকবে। মন চাইলে খেও, নইলে নয়। যেমন মানুষ তেমনই বন্ধু হবে তো!

আমার এখন অন্য চিন্তা। অন্নচিন্তা নয়। কী বিষয়ে বলা যায়?

হঠাৎ মনে পড়ে গেল প্রফেসর তারকমোহন দাশের তোলা অজন্তার রঙিন ছায়াচিত্রগুলোর কথা। ভাইপোর কাছ থেকে প্রজেক্টার, স্ট্যান্ড আর স্ক্রীন ইত্যাদি চেয়ে নিলাম। স্থির করলাম অজন্তার বিষয়েই বলব। সে-আমলে অজন্তার উপর লেকচার দিতে হলে আমার কোন মহড়ার বা পূর্বপ্রস্তুতির প্রয়োজন হত না। ছবিগুলি নম্বর দিয়ে সাজানো। ওরাই বক্তাকে হাত ধরে এগিয়ে নিয়ে যাবে। খানা-খন্দে পড়ার অথবা ধাপ-ডিঙিয়ে যাবার আশঙ্কা নেই। প্রক্ষেপণ-যন্ত্রই বক্তাকে পরিচালিত করবে।

অফিসের গাড়ি এলে হাজিরা সিংকে বললাম যন্ত্রপাতি গাড়ির ডিকিতে উঠিয়ে নিতে। অফিসে গিয়ে সারাদিন নিজের কাজকর্মে ডুবে আছি। অপরাহ্ণের অ্যাপয়েন্টমেন্টটার কথা মনেও নেই। পাঁচটা বাজল। উঠব-উঠব করছি, হঠাৎ আর্দালি পিয়নটা এসে বললে, আপনার সঙ্গে একজন দেখা করতে চায়, স্যার!

এই অবেলায় আবার কে এল জ্বালাতে?

লোকটা এসে পরিচয় দিল—ধীরেশের ড্রাইভার।

মনে পড়ল সব কথা। নিজে দাঁড়িয়ে থেকে প্রজেক্টার-স্ক্রীন ইত্যাদি ধীরেশের গাড়িতে তুলিয়ে দিলাম। আমার অফিস তখন সি. আই. টি. রোডে। ধীরেশের ড্রাইভার জানালো আমাদের গন্তব্যস্থল ডালহৌসী-পাড়ায়, কিরণশঙ্কর রায় রোডে। অফিস-টাইমের ভিড় কাটিয়ে এসে পৌঁছলাম ডালহৌসি এলাকায়। কিরণশঙ্কর রায় রোডে, রাজভবনের গেট পার হয়েই ডানদিকে একটা অ্যাসোসিয়েশন হল-এর সামনে এসে দাঁড়ালো গাড়িটা। কিছু ফুল আর ফেস্টুন দিয়ে উৎসবের আমেজ। আমাকে দেখতে পেয়ে এগিয়ে এল ধীরেশ। বললে,

এই যে, তুই এসে গেছিস ! আয় আয়, তোর সঙ্গে আমাদের সেক্রেটারির আলাপ করিয়ে দিই। ইনি হচ্ছেন....

সেক্রেটারি ভদ্রলোক এগিয়ে এলেন। প্যান্ট-শার্ট। বুকপকেটে একটা জমকালো ব্যাজ। এক হাতে লাঠি। চোখে কালো চশমা। যে ভঙ্গিতে তিনি এগিয়ে এলেন তাতে বুঝলাম তিনি দৃষ্টিশক্তিহীন। আমার দুটি হাত নিজ হাতে নিয়ে বললেন, আপনি যে সত্যি সত্যি আসবেন—মানে আজ অফিস-ডে তো, সারাদিন নিশ্চয় খাটাখাটি গেছে !

আমি কিছু জবাব দেবার আগেই আরও দু-চারজন এসে আমাকে অভিনন্দন জানালেন। একজন বললেন, দোরগোড়ায় ওঁকে আটকে রেখেছ কেন ? একেবারে মঞ্চে নিয়ে গিয়ে বসাও !

চোখ তুলে তাকিয়ে দেখি, তাঁরও চোখে কালো চশমা।

রাস্তা ছেড়ে হলে ঢুকবার আগে নজর পড়ল বড় ফেস্টুনটির দিকে। গেটের ওপর টাঙানো।

"সেন্ট জন্‌স্ অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত দৃষ্টিহীনদের বার্ষিক মিলনোৎসব"।

ধীরেশ এগিয়ে এসে বললে, আয়। তোকে সরাসরি মঞ্চে নিয়ে গিয়ে বসাই।

আমি চাপা ধমক দিই : রাস্‌কেল ! এটা আগে বলতে কী হয়েছিল ?

ও জবাব দেবার আগেই ওর ড্রাইভার প্রশ্ন করে, স্যার, এগুলো কোথায় রাখব ?

ধীরেশ জানতে চায় : কী ওগুলো ?

জবাব দিই আমি, প্রজেক্টার। আমি ওঁদের অজন্তার ছবি দেখাব বলে স্লাইডস্ নিয়ে এসেছিলাম !

এতক্ষণে ধীরেশ বুঝতে পারে, কেলেঙ্কারিটা কতদূর গড়িয়েছে। আমার দিকে ফিরে বললে, আয়াম সরি।

প্রজেকটার স্ক্রীন-স্ট্যান্ড ইত্যাদি আবার গাড়িতে তুলে মঞ্চে ফিরে এসে বসলাম। সভায় প্রায় শ'চার-পাঁচ শ্রোতা। পুরুষ এবং মহিলা। নানান বয়স, নানান পোশাক, নানান ধর্মের, নানান জাতের। সাদৃশ্য দুটি : সবাই মানবশিশু এবং সবাই দৃষ্টিহীন।

উদ্বোধন সঙ্গীত যিনি গাইলেন সেই মহিলাটিও অন্ধ।

তারপর ধীরেশ বেশ বাগিয়ে আমার পরিচয় দিল। আমি তখন মনে মনে ভাবছি—আমার জন্য ওরা আধঘণ্টা সময় বরাদ্দ করেছে। বিনা প্রস্তুতিতে অন্তত মিনিট পনের আমাকে চালিয়ে যেতেই হবে ! কী বলব ? ওঁদের দৃষ্টিহীনতার

প্রসঙ্গ না তোলাই ভাল। হয়তো সারাদিন সবাই সেটা নিয়েই কচকচি করেছে। আর শুধু সারাদিন কেন? হয়তো সারাজীবন ধরেই ওঁরা ঐ একটা প্রসঙ্গই আলোচিত হতে শোনেন—পথে-ঘাটে, বাজারে-বাড়িতে : আহা, বেচারি যে চোখে দেখে না!

একসময় ধীরেশের ইন্ট্রোডাকশান শেষ হল : এবার শ্রীনারায়ণ সান্যাল আপনাদের কিছু বলবেন।

মাইকটা ধরে আমি বলতে থাকি : আপনাদের বার্ষিক মিলনোৎসবে আমাকে আমন্ত্রণ করায় আমি খুবই সম্মানিত বোধ করছি। ধীরেশ আমার বাল্যবন্ধু। ফলে সে আমার বিষয়ে অনেক কিছু বাড়িয়ে বাড়িয়ে বলেছে। বন্ধু গর্বে, বন্ধুর ভালবাসায়। আমি জানি, বাস্তবে আমি লোকটা আপনাদের কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত। আমার নামটা হয়তো আপনাদের অধিকাংশ আজ জীবনে প্রথম শুনলেন। কারণ আমার লেখা কোনও বই 'ব্রেইল-প্রিন্টে' ছাপা হয়নি।

সামনের সারি থেকে একজন বৃদ্ধ শ্রোতা উঠে দাঁড়ালেন। ডান হাতটা তুলে বললেন, মাপ করবেন নারায়ণবাবু, আমাকে একটা কথা বলতে দেবেন?

আমি থতমত খেয়ে থেমে যাই।

উনি বলেন, আপনার ধারণাটা ভুল। এ সভাগৃহের অধিকাংশই আপনাকে চেনে, আপনার সাহিত্যকর্মের সঙ্গে আমাদের অ্যাসোসিয়েশানের সভ্যবৃন্দ যথেষ্ট পরিচিত। ঠিক কথা, আপনার কোন বই 'ব্রেইল-প্রিন্টে' ছাপা হয়নি। তবু আপনি যে আমাদের কত পরিচিত তার একটা প্রমাণ আমি এখনি দিতে চাই।

বলেই তিনি আমার দিকে পিছন ফিরলেন। শ্রোতৃবৃন্দের দিকে ফিরে বললেন, বন্ধুগণ! আপনাদের মধ্যে আকাশবাণী প্রচারিত নারায়ণ সান্যালের এই তিনটি শ্রুতিনাটকের যে কোন একটা শুনে থাকলে দয়া করে হাত তুলুন : 'নীলিমায় নীল', 'তিমি-তিমিঙ্গিল' আর 'সুতনুকা কোনও দেবদাসীর নাম নয়'।

আমি সেদিন হৃদয়ঙ্গম করলাম—আকাশবাণীর কী প্রচণ্ড অবদান ঐ বিশেষ শ্রেণীভুক্তদের আনন্দবিতরণে। শতকরা আশি-নব্বই ভাগ শ্রোতা—পুরুষ এবং স্ত্রী—হাত তুললেন।

বৃদ্ধ ভদ্রলোক আবার আমার দিকে ফিরে বললেন, ওটাও কিন্তু আপনার ভুল ধারণা!

আমি বিহ্বলের মতো প্রশ্ন করি : কোনটা?

—আপনি ভাবছেন, অডিটোরিয়ামে কতগুলি হাত উঠেছে তা শুধু আপনিই

দেখতে পাচ্ছেন, আমি পাচ্ছি না ! তাই নয় ? আজ্ঞে না, আমিও পাচ্ছি ; শতকরা আশি-নব্বইটা হাত উঠেছে। কেমন করে দৃষ্টিহীন হওয়া সত্ত্বেও তা দেখতে পারছি, বলতে পারেন ?

আমার বিহ্বলতা তখনো কাটেনি। বলি, আজ্ঞে না।

উনি হেসে বললেন, আপনার 'নীলিমায় নীলে'র নায়ক আনন্দকে বরং প্রশ্নটা শুধিয়ে দেখবেন। সে দৃষ্টিহীন হওয়া সত্ত্বেও কী করে বুঝতে পেরেছিলে—শেষ দৃশ্যে নীলিমাই ফিরে এসেছিল ওর ভাঙাঘরে ?

আমি জবাব দিতে পারিনি। উনি বলে : এ কোনও অলৌকিক ক্ষমতাবলে নয়। আমি যে জানি, আমাদের সভ্য-সভ্যারা থিয়েটার-সিনেমার টিকিট কেনে না, টর্চ কেনে না, বাল্‌ব কেনে না, ছবির বই কেনে না, কিন্তু কিছু পয়সা জমলেই একটা সস্তা রেডিও কেনে, অথবা ট্র্যানজিস্টার। গানের জগৎটা তো এখনো বন্ধ হয়ে যায়নি আমাদের শ্রুতি থেকে। প্রতিটি শ্রুতিনাটক ওরা হুমড়ি খেয়ে শোনে, আপনারা যেমন ভাবে হুমড়ি খেয়ে পড়েন ফিল্‌ম্‌ ফেস্টিভ্যালের টিকিট কিনতে। নিন, শুরু করুন আপনার বক্তৃতা।

আমার মাথায় ভূত চাপল। আমি তৎক্ষণাৎ স্বীকার করে বসলাম আমার অবস্থা। বন্ধু ধীরেশ আমাকে আগেভাগে জানায়নি যে, আমি কাদের কাছে বক্তব্য রাখতে আসছি। কিছুটা দোষ বন্ধু ধীরেশের, কিছুটা আমারও। আমার উচিত ছিল সেটা জেনে আসা। আমি স্বীকারই করছি, আপনাদের দেখাব বলে আমি কিছু অজন্তার স্লাইডস্‌ নিয়ে এসেছিলাম। আজকে আমার বক্তৃতার বিষয় ছিল : অপরূপা অজন্তা !

ভদ্রলোকই আবার উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, তা যখন সম্ভবপর নয়, তখন বলুন আপনার সাহিত্য-জীবনের অভিজ্ঞতা। এঞ্জিনিয়ার হওয়া সত্ত্বেও....

আমি বাধা দিয়ে বলি, আজ্ঞে না, আমি আমার বক্তৃতার বিষয়বস্তু বদলাব না। আমি আপনাদের কাছে অজন্তার কাহিনীই শোনাব। অজন্তায় কী আছে, কে গড়েছে, কেন গড়েছে ! আমি আপ্রাণ চেষ্টা করব শুধু শব্দের মাধ্যমে অজন্তার ছবি আঁকতে।

* * *

বিশ্বাস করুন, এ আমার জীবনের এক দুর্লভ অভিজ্ঞতা। ধীরেশ ইচ্ছে করে আমাকে লেঙ্গি মেরে অপ্রস্তুত করতে চেয়েছিল, এটা আমি বিশ্বাস করি না। ও বুঝতে পারেনি, এতে আমি কী পরিমাণ অসুবিধার মধ্যে পড়ব ! কিন্তু

নিজের অজান্তে ধীরেশ আমাকে একটি সুদুর্লভ অনুভূতি লাভ করার সৌভাগ্যকে পাইয়ে দিল।

আমি বলতে শুরু করলাম। গৌতম বুদ্ধদেবের জীবনকথা—ক্রমে তাঁর প্রভাবে সমগ্র এশিয়া কীভাবে প্রদীপ্ত হয়ে ওঠে। সম্রাট অশোকের কথা। গুহামন্দির নির্মাণ—অজন্তার দশম ও নবম গুহা কারা, কেন খনন করতে এলেন। ক্রমে গড়ে উঠল একটি সঙ্ঘরাম। দীর্ঘ নয় শতাব্দী ধরে। ত্রিশটি বিহার, চারটি চৈত্য। গত শতাব্দীতে গ্রিফিথ-সাহেব ষোলোটি গুহায় দেখেছিলেন বিচিত্র ম্যুরাল। আজ মাত্র চারটি গুহায় তার আভাস পাওয়া যায়—প্রথম, দ্বিতীয়, ষোড়শ ও সপ্তদশ!

তারপর আমি প্রবেশ করলাম প্রথম গুহায়। মহাজনক জাতকের কাহিনী বলতে বলতে হঠাৎ আমার মনে হল—সামনে বসা ঐ দৃষ্টিহীন শ্রোতার দল আমার চিন্তাস্রোতে বাধাসৃষ্টি করছেন। মহারাজ শিবি যেমন নিজের দুটি চোখ উপড়ে ফেলে পরমসত্য লাভ করেছিলেন, সেভাবে ঐ শ্রোতৃবৃন্দের সমতলে নেমে এলেই আমি সার্থক হব, পরমসত্যকে লাভ করব। আমি তারপর চোখ বুজে অজন্তার বর্ণনা করতে শুরু করলাম। সে এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা! জীবনে প্রথম ও জীবনে শেষ! আমার রুদ্ধদৃষ্টির সামনে ফুটে উঠল একে একে অজন্তার এক-একটি অপূর্ব চিত্র। ঠিক যেভাবে সূর্যাস্তের পর অন্ধকার ঘনিয়ে এলে এখানে-ওখানে ফুটে উঠতে থাকে দু-একটি তারা। প্রথমে মিটমিট করে জ্বলে। তারপর তারা ভিড় করে আসে। কোনটা জোনাকী আর কোনটা শ্রবণা, স্বাতী, চিত্রা, ব্রহ্মহৃদয় চিনে উঠতে পারা যায় না! সেইভাবেই আমার বন্ধ চোখের পাতার ক্যানভাসে ভিড় করে এল গন্ধর্ব, কিন্নর, মদালসা, নিপুণিকা, চতুরিকার দল। এল সীবলী, মাদ্রী, সুমনা, কৃষ্ণারাজকুমারী, কৃষ্ণা-অপ্সরার মিছিল।

অলৌকিকতায় আমি বিশ্বাস করি না, মন্ত্রশক্তিতেও নেই কোন আস্থা। কিন্তু এ-কথাও তো মানতে হবে যে, বিধাতার এই বিচিত্র সৃষ্টি কোটি কোটি নিউরন-সেল সমন্বিত মানবমস্তিষ্কের সঠিক হদিস আজও পায়নি বিজ্ঞান! কী করে কী হল, কেন হল বলতে পারব না; কিন্তু বেশ মনে আছে, চোখ বন্ধ করে বুদ্ধদেবের উদ্দেশে প্রার্থনামন্ত্র উচ্চারণের পর থেকেই আমি নিজের ব্যক্তিসত্তাকে হারিয়ে ফেলেছিলাম। আমার মনে ছিল না যে, বি-বা-দী-বাগে কিরণশঙ্কর রায় রোডে আমি দাঁড়িয়ে আছি শ'-পাঁচেক দৃষ্টিহীনের সম্মুখে! আমি যেন কোন মন্ত্রবলে সূক্ষ্মদেহে উপনীত হয়েছি বাঘোরা নদী বিধৌত অজন্তা গুহায়—ভিন্ন কালে, ভিন্ন শতাব্দীতে! স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি করুণাঘন অবলোকিতেশ্বর

পদ্মপাণিকে ! রাজপুত্রের বিরহে ম্লান কৃষ্ণা রাজনন্দিনীকে, মেঘলোকে ভাসমান গন্ধর্বদের, নায়কের বাহুবন্ধনে আশ্লেষশয়না মদিরাবিহ্বলা নায়িকাকে। আর দেখতে পাচ্ছি সপ্তদশ বিহারের সেই বিশাল মহাভিক্ষুর আভাস ! এসেছেন কপিলবস্তুতে ধর্মপত্নী ও পুত্রের কাছে ভিক্ষা নিতে ! দেশ-কালের গণ্ডি ছাড়িয়ে ভক্তি-রসাপ্লুত শিল্পস্বর্গে আমি 'বামির' হাতের দীপশিখাটির মতো নিঃশেষে হারিয়ে গেছিলাম।

হঠাৎ আস্তিনে টান পড়ায় সম্বিত ফিরে এল। ধীরেশ আমার কানে কানে বলছে, সওয়া এক ঘণ্টা নাগাড়ে বক্‌বক্ করছিস, এবার থাম্। অন্যান্য শিল্পীরা....

প্রেক্ষাগৃহে একটা প্রতিবাদ শোনা গেল। ওঁরা চোখে দেখেননি যে, ধীরেশ আমার আস্তিন ধরে টেনেছে ; কিন্তু ঠিকই বুঝতে পেরেছেন।

ততক্ষণে আমার চোখ খুলে গেছে। উভয় অর্থেই। আমি সশরীরে ফিরে এসেছি বাঘোড়া নদীর উপল-বন্ধুর বঙ্কিম শিল্পস্বর্গ থেকে এই বি-বা-দী বাগে।

আমি হাত দুটি জোড় করলাম। আমার তখন মনে পড়ল না যে,আমার যুক্তকর-ভঙ্গিমা ওঁরা দেখতে পাবেন না—বরং আমি জানতাম, আমার কণ্ঠস্বরের শব্দস্পন্দনে ওঁরা দেখতে পাবেন যে, আমি যুক্তকরে ক্ষমা চাইছি। মাইকে বললাম, আমার আধঘণ্টা বলার কথা ছিল, আত্মহারা হয়ে আমি সওয়া-ঘণ্টা বলেছি। আমাকে এবার মার্জনা করবেন। পরবর্তী শিল্পীরা অনেকক্ষণ অপেক্ষা করছেন।

টল্‌তে টল্‌তে নেমে এলাম মঞ্চ থেকে। ভাবের ঘোরটা যেন তখনো কাটেনি। স্বীকার করতে সঙ্কোচ নেই, আমি কিছু সেন্টিমেন্টাল। অনেকে এগিয়ে এসে আমাকে অনেক কিছু বললেন। সে-সব কথা থাক। শুধু একজনের একটা কথা ভুলিনি, তিনি বলেছিলেন : 'অজন্তায় সশরীরে গেলেও কিছু দেখতে পাব না। আপনাকে প্রণাম—আপনি আমার দেবদর্শন করিয়ে দিয়েছেন।'

ধীরেশ বললে, দারুণ বলেছিস মাইরি ! তা হ্যাঁরে, রাতে মোকাম্বোতে আমরা জনাপাঁচেক ডিনার করব, তুই আসছিস্ তো ? মিসেসকে বলে এসেছিস তো ? না হয় একটা ফোন করে দে !

বললুম, না রে, আজ বাদ দে ! এখন ওসব ভাল লাগবে না ! তুই তোর ড্রাইভারকে বল আমাকে বাড়ি পৌঁছে দিতে।

—অন্তত এখানেই কিছু চা-জলখাবার....

—প্লীজ ধীরেশ....

ও আমাকে আপাদমস্তক দেখে নিয়ে বলল, বুঝেছি। তুই সেই একই রকম

সেন্টিমেন্টাল পাগলাই আছিস ! স্কুলে যেমন ছিলি ! তোর ঘোর এখনো কাটেনি মনে হচ্ছে.... ।

ড্রাইভারকে ডেকে আমাকে গাড়িতে তুলে দিল। ড্রাইভারকে বলল, সাহেবকে বাড়ি পৌঁছে দেবে। যন্ত্রপাতিগুলো মাইজিকে বুঝিয়ে জিম্মা করে দেবে। আর শোন.....

অনুচ্চকণ্ঠে ড্রাইভারকে বললে, সাহেব যদি গঙ্গার ধারে বা অন্য কোথাও বসতে চায়, শুনবে না--সোজা বাড়ি নিয়ে যাবে। বুঝেছ ? সাহেব একটু...মানে ইয়ে, বে-এক্তিয়ার আছেন।

ড্রাইভারটাও আমাকে একবার আপাদমস্তক দেখে নিয়ে বললে, জী সাব, সম্‌ঝা !

বোধ করি বেহেড মাতালদের বাড়ি পৌঁছে দেবার অভ্যাস ওর আছে। পার্টি-ফেরত এমন অনেক মদ্যপকে তাঁদের নিজ নিজ মেমসাহেবদের জিম্মা করে দিয়ে অনেকবার গাড়ি গ্যারেজ করেছে।

আমিও তো তাই। মদ-মাতাল নাই হলাম, মন-মাতাল তো বটে !

সমাপ্ত

নারায়ণ সান্যাল

রানী হওয়া